শাসনধ্বজ প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের জীবন-চরিত

শ্রীমৎ সুমঙ্গল ভিক্ষু

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Suvananda Bhante

শাসনধ্বজ প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের জীবন-চরিত

শ্রীমৎ সুমঙ্গল ভিক্ষু
অধ্যক্ষ, ওসখাইন সদ্ধর্মানন্দ বিহার
আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।

শাসনধ্বজ প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের জীবন-চরিত

শ্রীমৎ সুমঙ্গল ভিক্ষু কৃত

প্রকাশকাল

২৩ নভেম্বর ২০০৭ইংরেজী
৯ অগ্রহায়ণ ১৪১৪ বাংলা
২৫৫১ বুদ্ধবর্ষ

প্রকাশক

রঞ্জন বড়ুয়া

সহযোগিতায়

অঞ্জন বড়ুয়া, প্রদীপ বড়ুয়া
অঞ্জনা বড়ুয়া, সুজন বড়ুয়া ও প্রমি বড়ুয়া
চেনামতি,আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।

সম্পাদনায়

প্রফেসর ড. দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া
প্রাচ্যভাষা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

মুদ্রণে

এলিট কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
৭ জি.এ. ভবন (২য় তলা) আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ঃ ০১৫৫৪-৩১৩৭৩৪

শ্রদ্ধাদান ঃ ৩০ টাকা (প্রজ্ঞাতিষ্য স্মৃতি ফাণ্ডের জন্য)

SASANADHVAJA PRAJNATISYA MASTAVIRAR JIVAN-CHARIT

by

Srimat Sumangal Bhikshu

Published by

Ranjan Barua

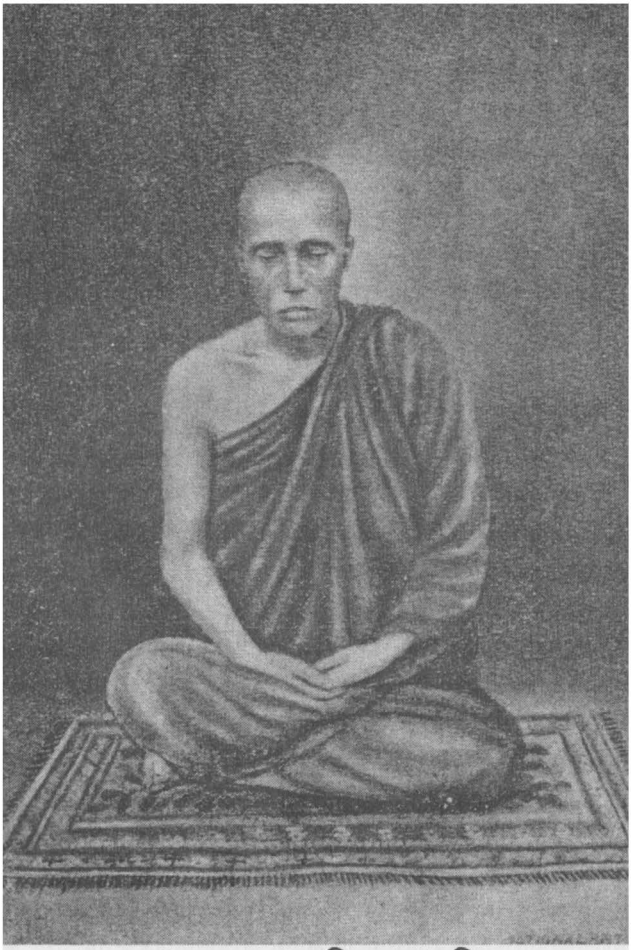

শাসনধ্বজ প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির

আবির্ভাব ঃ ৩ ফাল্গুন ১২৭৮ বঙ্গাব্দ, ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দ

মহাপ্রয়াণ ঃ ৪ চৈত্র ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দ

উৎসর্গ

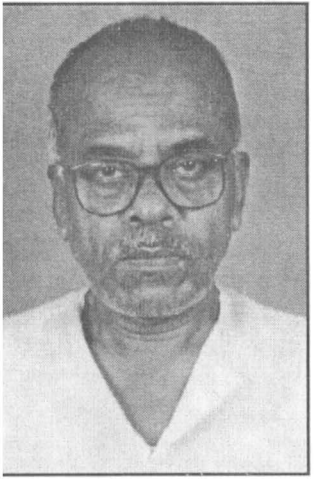

স্বর্গীয় রবীন্দ্র লাল বড়ুয়া

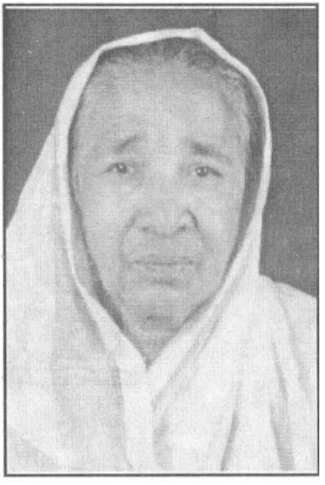

স্বর্গীয়া শিলপ্রিয়া বড়ুয়া

পিতা-মাতার পুণ্যস্মৃতি স্মরণে প্রয়াত পণ্ডিত শাসনধ্বজ প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের জীবন-চরিত গ্রন্থখানা প্রকাশিত হলো

স্নেহধন্য পুত্র
রঞ্জন বড়ুয়া
সহধর্মিনী ইন্দ্রা বড়ুয়া

-ঃ সুচী ঃ-

১। প্রাসঙ্গিক কথা
২। লেখকের অভিব্যক্তি
৩। প্রকাশকের নিবেদন
৪। ভূমিকা
শাসনধ্বজ প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের জীবন-চরিত
৫। সূচনা
৬। জন্ম
৭। প্রব্রজ্যা লাভ
৮। সংঘরাজ পূর্ণাচার চন্দ্রমোহন মহাস্থবিরের সান্নিধ্যে
৯। শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার অনুশীলন
১০। শ্রীলংকা গমন
১১। দ্বিতীয়বার লংকা গমন ও ধাতু নিধান
১২। ব্রহ্মদেশে গমন
১৩। ব্রহ্মদেশে বিহার প্রতিষ্ঠা
১৪। ভারতের তীর্থস্থান দর্শনে
১৫। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ধ্যান সাধনায়
১৬। সদ্ধর্ম প্রচারে
১৭। পণ্ডিত ও শাসনধ্বজ অভিধা লাভ
১৮। মুচ্ছদ্দীপাড়ায় অন্তিম জীবন
১৯। প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের শিষ্যমণ্ডলী
২০। সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড
২১। মহাপ্রয়ান
২২। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য
২৩। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া
২৪। প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের কতিপয় অলৌকিক ঘটনা
২৫। সপ্তগ্রাম শাসন কল্যাণ ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদ
২৬। পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের সাধনপীঠ মুচ্ছদ্দীপাড়া বিবেকারাম বিহারের বর্তমান অধ্যক্ষ সাধক শাসনমিত্র মহাস্থবিরের কার্যক্রম।
২৭। উপসংহার

প্রাসঙ্গিক কথা

'বাঙালিরা বড়ই বিস্মৃত জাতি।' বাঙালি বৌদ্ধরাও আরো একধাপ এগিয়ে। বাঙালি বৌদ্ধদের অতীতের বহু খ্যাতি কীর্তি রয়েছে। কিন্তু সেই কীর্তি যারা সৃষ্টি করেছেন তার কোনো নির্ধারিত সন তারিখ যেমন দৃষ্ট হয় না, তেমনি যাঁরা এ কীর্তি সমূহের শ্রষ্ঠা তাঁদেরও কোনো পরিচিতি পাওয়া যায় না। বাঙালি বৌদ্ধদের বহু খ্যাতিমান ব্যক্তির আর্বিভাব হয়েছে, কিন্তু তাঁদের ধারাবাহিক কোনো জীবনী কিংবা কর্মকৃতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়নি। বিংশ শতকে বাঙালি বৌদ্ধদের নবজাগরণে অনেকে অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত শাসনধ্বজ প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবির অন্যতম। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ ভিক্ষু। তিনি বাংলা ১২৭৮ সনে ৩ ফাল্গুন জন্ম গ্রহণ করেন এবং বাংলা ১৩৩৮ সনে ৩ চৈত্র পরলোক গমন করেন। এই ক্ষণজন্মা সাংঘিক ব্যক্তির ধারাবাহিক কোনো জীবনী গ্রন্থ রচিত হয়নি। ১৯৮০ ইং সনে শ্রীমৎ কোণ্ডাঞ্ঞ ভিক্ষু একটি সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য রচনা করেন। সপ্তগ্রামের মুচ্ছুদ্দিপাড়া বিবেকারাম বিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ শাসনমিত্র মহাস্থবির ও চেনামতি গ্রামের সমাজ সচেতন যুবক বাবু রঞ্জন বড়ুয়া এবং অপরাপর নেতৃবৃন্দের অনুপ্রেরণায় কয়েক বছর পূর্বে ওসখাইন বিহারের অধ্যক্ষ নবীন প্রতিশ্রুতিশীল ভিক্ষু শ্রীমৎ সুমঙ্গল ভিক্ষু তাঁর জীবনী গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ~~১৯৯৪~~ ২০০০ সনে অসুস্থ হয়ে দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর বিগত ~~১৯৯৫~~ ২০০৫ সনের ২৮ নভেম্বর মৃত্যু বরণ করলে জীবনী গ্রন্থটি আর প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

শ্রীমৎ সুমঙ্গল ভিক্ষুর মৃত্যুর পর তাঁর কল্যাণমিত্র শ্রীমৎ শাসনমিত্র মহাস্থবির ও বাবু রঞ্জন বড়ুয়া এ জীবনী গ্রন্থটি প্রকাশের আগ্রহ প্রকাশ করে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পাণ্ডুলিপিটি আমি আদ্যন্ত পাঠ করে তার লেখায় ভাষাগত বেশ কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করি। কর্মব্যস্ততার কারণে এটা সংশোধন করতে আমার বেশ কিছু সময় লেগে যায়। তবু সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত হয়েছে বলে আমি মনে করি না। এতদসত্ত্বেও পাঠকসমাজ একজন বহু গুণে গুণান্বিত মহান আদর্শ ভিক্ষুর সংক্ষিপ্ত জীবনেতিহাস এ পুস্তিকা থেকে লাভ করতে পারবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

এ জীবনী গ্রন্থের লেখক শ্রীমৎ সুমঙ্গল ভিক্ষু একজন প্রতিশ্রুতিশীল উদ্যোগী বিদ্যোৎসাহী নবীন ভিক্ষু ছিলেন। তাঁর অকাল প্রয়াণে সমাজ-সদ্ধর্মের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে-এটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

গ্রন্থখানি প্রকাশের ব্যাপারে শ্রীমৎ শাসনমিত্র মহাস্থবির ও বাবু রঞ্জন বড়ুয়ার আন্তরিক আগ্রহ যদি না থাকত তাহলে প্রকাশিত হতো না। এটা প্রকাশের ব্যয়ভার বহন করেছেন তরুণ সমাজকর্মী বাবু রঞ্জন বড়ুয়া। প্রকাশের ব্যাপারে তিনি বেশ কয়েকবার আমার সাথে যোগাযোগ করেছেন, বাসায় দেখা করেছেন। পুণ্যপুরুষের পুণ্যময় জীবন কাহিনী নিয়ে রচিত এ ক্ষুদ্র গ্রন্থটি প্রকাশ করে রঞ্জন বাবু অশেষ পুণ্যের অংশীদার হয়েছেন। তাঁর এ শুভ কাজের জন্য আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই এবং শ্রীমৎ শাসনমিত্র মহাস্থবিরকে সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা দানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।

সব্বে সত্তা সুখীতা ভবন্তু।

দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম।
২০/১০/২০০৭

লেখকের অভিব্যক্তি

ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের আবির্ভাব জগতে বিরল। তাঁরা যেখানে সেখানে যখন তখন জন্ম গ্রহণ করেন না। যে সমাজে জন্ম গ্রহণ করেন সে সমাজ অতি ধন্য গৌরবান্বিত ও কৃতার্থ হয়। আমাদের বাঙালি বৌদ্ধ সমাজে বহু জ্ঞানী-গুনী সমাজ-সদ্ধর্ম হিতৈষী ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে, তাঁরা আজীবন সমাজ ও শাসনের কল্যাণে ব্রতী হয়ে স্বীয় জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। এমন বহু সনামখ্যাত মনীষী যারা আমৃত্যু পরহিতব্রতে নিবেদিত ছিলেন, তাদের অনেকে আজ বিস্মৃতির অন্তরালে তলিয়ে গেছেন। অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাঙালি বৌদ্ধদের কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। যে বৌদ্ধরা বাংলাদেশসহ সমগ্র ভারতবর্ষে একসময় একছত্র শাসন করেছিল, এমন কি বৃহত্তর বাংলাদেশে পালবংশীয় বৌদ্ধ রাজারা একাক্রমে চার শতাধিক বছর শাসন করেছিলেন তাদের পর বাঙালি বৌদ্ধদের আর ধারাবাহিক কোনো ইতিহাস রক্ষিত কিংবা লেখা হয়নি। সমগ্র ভারতবর্ষে যারা বৌদ্ধ শিল্প, স্থাপত্য, সাহিত্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি অক্লান্ত পরিশ্রম করে সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁদের সম্পর্কেও ইতিহাস নীরব। এটা বৌদ্ধদের জন্য অত্যন্ত গ্লানিকর।

আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেও আমরা কেমন জানি নিজেদেরকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারছি না। বাঙালি বৌদ্ধদের অন্যতম কৃতি সাংঘিক ব্যক্তিত্ব, সংগঠক, সমাজসংস্কারক, সাধক, পণ্ডিত শাসনধ্বজ শ্রীমৎ প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির ১৮৭১ সালে জন্ম গ্রহণ করে বাল্যকালে শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত প্রায় অর্ধশতাব্দিকাল সমাজ-সদ্ধর্মের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বহু গুণে গুণান্বিত এই মহান পুরুষের ধারাবাহিক কোনো জীবনী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। আমি সপ্তগ্রাম এলাকায় অবস্থান করার সময় এইপুণ্যপুরুষ সম্পর্কে প্রবীণ ভিক্ষু সংঘ ও দায়ক-দায়িকার কাছে জানতে পেরে অভিভূত হই। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, ধর্ম-বিনয়ে অপরিসীম শ্রদ্ধাবোধ, ধ্যান-সাধনায় একনিষ্টতার বিষয় এতদঞ্চলের প্রবীণ জনসাধারণের মুখে মুখে কিংবদন্তীর মতো চলে আসছে। আমি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় নমিত হই এবং তাঁর জীবন চরিত রচনায় সংকল্পবদ্ধ হই। আমার স্থির বিশ্বাস, এই মহান পুণ্যপুরুষের জীবনেতিহাস পাঠ করলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাঁকে জানতে পারবে এবং জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ হবে।

আমার সংকল্পের কথা ব্যক্ত করলে তালসরা মুৎসুদ্দীপাড়া বিবেকারাম

বিহারের সম্মানিত অধ্যক্ষ শ্রীমৎ শাসনমিত্র মহাস্থবির, চেনামতি বিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ ধর্মমিত্র মহাস্থবির, তিশরী বিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ বিজয়রক্ষিত মহাস্থবির, রুদুরা বিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ বোধিরতন স্থবির, তালসরা গ্রাম নিবাসী বাবু রেবতী রঞ্জন বড়ুয়া, মুৎসুদ্দীপাড়া গ্রামের সুশীল মুৎসুদ্দী ও ওসখাইন গ্রামের মনোরঞ্জন বড়ুয়াসহ অনেকে প্রয়াত পণ্ডিত ভান্তের জীবনী রচনার জন্য উৎসাহিত ও অনুপ্রেরণা দান করেন। আরো অনেকের কাছ থেকে এমন কি কয়েকজন হিন্দু-মুসলমানের কাছ থেকেও তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রাপ্ত হই। বিভিন্ন ব্যক্তির থেকে প্রাপ্ত তথ্য, কিংবদন্তী এবং তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কার্যবিবরণী ও শ্রী কোণ্ডাঞ্ঞ ভিক্ষু রচিত ছোট্ট একটি জীবনী গ্রন্থের আলোকে আমি পরম পুণ্যপুরুষ পণ্ডিত শাসনধ্বজ প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখার প্রয়াস পেয়েছি। আমি তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এ অঞ্চলে দীর্ঘকাল অবস্থান করে যারা সমাজ-সদ্ধর্মের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছেন তাঁদের মধ্যে বাথুয়া জ্ঞানোদয় বিহারের অধ্যক্ষ প্রয়াত শ্রীমৎ প্রিয়ানন্দ মহাস্থবির, ওসখাইন বিহারের অধ্যক্ষ প্রয়াত একাদশ সংঘরাজ শ্রীমৎ শাসনশ্রী মহাস্থবির, তালসরা আনন্দারাম বিহারের অধ্যক্ষ প্রয়াত শ্রীমৎ বুদ্ধদত্ত মহাস্থবির প্রমুখের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।
আমার গুরুদেব বাথুয়া জ্ঞানোদয় বিহারের অধ্যক্ষ বিনয়াচার্য শ্রীমৎ সংঘরক্ষিত মহাস্থবিরের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও বন্দনা জ্ঞাপন করছি, যার অকৃত্রিম স্নেহ আমাকে ধন্য ও কৃতার্থ করেছে।

এ মহৎ জীবনী গ্রন্থটি প্রকাশ করার পুণ্যময় দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন চেনামতি গ্রামের উদীয়মান যুবক সদ্ধর্ম সেবক বাবু রঞ্জন বড়ুয়া। আমি তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ সুখী সমৃদ্ধ জীবন প্রার্থনা করি।

আমার উপস্থাপনায় অনিচ্ছাকৃত কোনো ত্রুটি থাকলে তজ্জন্য ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি প্রত্যাশা করি। আর এ ক্ষুদ্র জীবনী গ্রন্থটি পাঠে কারো কিঞ্চিত পরিমাণ উপকার হলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।

নিবেদক-

সুমঙ্গল ভিক্ষু

অধ্যক্ষ, ওসখাইন সদ্ধর্মানন্দ বিহার

আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।

প্রকাশকের নিবেদন

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন বৌদ্ধ সমাজে আলোর মশাল হাতে যে কয়জন সমাজ ও সদ্ধর্মের কল্যাণে আত্মনিবেদন করে অমর হয়ে আছেন তন্মধ্যে প্রতিথযশা খ্যাতিমান সাংঘিক পুরুষ সাধক পণ্ডিত প্রবর শাসনধ্বজ প্রয়াত শ্রীমৎ প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির অন্যতম। এ মহান সাধক পুরুষের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী গ্রন্থ দীর্ঘ আট দশকের মধ্যেও রচিত হয়নি। ওসখাইন বিহারের অধ্যক্ষ তরুণ ভিক্ষু অকাল প্রয়াত শ্রীমৎ সুমঙ্গল ভিক্ষু এ মহৎ কাজটি সম্পাদন করেছেন। মহাপুরুষদের জীবনী ও জীবনাদর্শ পরবর্তী প্রজন্মকে নিঃসন্দেহে অনুপ্রাণিত করে।
পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের মহৎ জীবনালেখ্য বাস্তবিকই কিংবদন্তী তুল্য। পাঠকসমাজ তাঁর এহেন পুণ্যময় জীবনী পাঠ করে উপকৃত হবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

পুণ্যময় পুরুষের পুণ্যময় জীবনী গ্রন্থখানা প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য ও গৌরবান্বিত বোধ করছি। এ গ্রন্থটি প্রকাশে আমাকে অনুপ্রাণিত করার জন্য পরম শ্রদ্ধেয় শাসনমিত্র মহাস্থবির, ধর্মমিত্র মহাস্থবির, প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, শীলানন্দ থের, বোধিরতন স্থবির, অনমদর্শী স্থবির, জিনরতন ভিক্ষু, প্রিয়রতন ভিক্ষু, শান্তরক্ষিত ভিক্ষু, শান্তপ্রিয় ভিক্ষু মহোদয়গণের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আরও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি অসিত বরণ বড়ুয়া, শ্যামল বড়ুয়া, অকাল প্রয়াত পরম জ্ঞাতি শীলব্রত বড়ুয়া এছাড়া গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি আগাগোড়া সংশোধনসহ পরিমার্জিত ভাষায় রূপদানে এবং প্রুফ সংশোধনে শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডঃ দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া অক্লান্ত শ্রম ও মেধা দিয়েছেন বিধায় এটা পুস্তকাকারে প্রকাশ সম্ভব হয়েছে তজ্জন্য তাঁকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আরো কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এলিট কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্সের স্বত্তাধিকারী সনত বড়ুয়াকে। এছাড়া গ্রন্থটি প্রকাশে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে আমার সহধর্মিনী ইন্দ্রা বড়ুয়া, ছেলে রাগীব বড়ুয়া অভি ও মেয়ে রিয়া বড়ুয়া।

গ্রন্থ প্রকাশ জনিত পুণ্যপ্রভাবে আমাদের সকলের কল্যাণ সাধিত হোক-এ কামনায়।

রঞ্জন বড়ুয়া

ভূমিকা

রিপু তাড়িত মোহ মুগ্ধ মানবের কাছে মহামনিষীগণের জীবনালেখ্য দিগদর্শনরূপে সাহায্য করে, জগতে এমন কতিপয় অষ্টঅক্ষণ বিনিমুক্ত সুক্ষণে পুণ্যদীপ্ত মহাপুরুষ অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। যাঁদের প্রাণের পরিবেশের মধ্যে মানুষ শুনতে পায় জীবন প্রগতির উষালোকের সঞ্জীবনী মন্ত্রধ্বনি, খুঁজে পায় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উজ্জ্বল আলেখ্য; আবিস্কৃত করতে পারে আকাশচুম্বী সভ্যতার হিরন্ময় ইমারত এবং রচনা করতে পারে জীবনায়নের অমর ইতিহাস; যাঁদের অফুরন্ত অদম্য উদ্দীপনায় জ্ঞান গরিমায় সংস্কৃতি সমাজ হয়েছে সুসংস্কৃত, জাতীয় জীবনে এনে দিয়েছেন জাগৃতি সংহতি তাঁদের মধ্যে মহান পুণ্য পুরুষ প্রজ্ঞাতিষ্য অন্যতম। মহামানব যাঁরা অতি মানব যাঁরা, তাঁরা সবসময় সব অবস্থাতে এই ধরা ধামে আসেন না। তাঁরা এমন এক সময় এমন অবস্থাতে কতকগুলি আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসেন। সেই অপরিমেয় গুণাবলী দ্বারা মুক্তি পাগল জনসাধারণ তাঁদেরকে মেনে নেন এবং শ্রদ্ধাপ্রসুত পুজার বেদীতে সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসন দেন। হিন্দুশাস্ত্রে যারা অবতার বৌদ্ধশাস্ত্রে তাঁরা অতিমানবরূপে স্বীকৃত। পৃথিবীবক্ষে যখন অধর্ম অত্যাচার নেমে আসে তখনই তাদের প্রাদুর্ভাব হয়।

পৃথিবীর আদর্শ সনাতন বৌদ্ধ ধর্মের ক্ষীণ প্রবাহ চট্টগ্রামের বৌদ্ধ সমাজ যখন মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল সে সময়ে বৌদ্ধ সূর্যসন্তান মহান শাসনধ্বজ 'প্রজ্ঞাতিষ্য ১৭৯৪ শকাব্দের ফাল্গুন মাসের ৩ তারিখ বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানাধীন চান্দখালী ও মুরালী খালের সঙ্গমস্থান তালসরা গ্রামে এক ছোট্ট পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম সুখীরাম ও মাতার নাম বিন্দুমতী; মা-বাবা আদর করে ডাকতেন 'বিশ্বম্ভর'। শৈশবে মাতা-পিতা হারা হলে ভগ্নি শ্রীমতি বাসনা ১২ বৎসর বয়সে কর্ণধন ভিক্ষুর নিকট শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষা করিয়ে দেন। বিশ বৎসর বয়সে পূর্ণাচার মহাস্থবিরের নিকট পূনঃ দীক্ষা গ্রহণ করে শুভ উপসম্পদা লাভ করেন। উচ্চ ধর্মীয় আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভের জন্য তিনবার লংকায় গমন করেন। সাত বৎসর রেঙ্গুনে অবস্থান করেন। তাছাড়া বেনারস, রাজগৃহ ও চট্টগ্রামের বিভিন্নস্থানে কয়েক বৎসর বর্ষা যাপন করে জীবনের শেষ ভাগে প্রায় বার বৎসর যাবত তালসরা মুচ্ছদ্দিপাড়া বিবেকারাম বিহারে

অবস্থান করে ১৮৫৩ শকাব্দে ৪ চৈত্র রাত্রি ২ ঘটিকায় সদ্ধর্ম গৌরব রবি প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির ইহলোক হতে অস্তমিত হন।

প্রয়াত পণ্ডিত ভন্তের প্রিয় শিষ্যগণ ছিলেন শ্রীমৎ গুণতিষ্য স্থবির, শ্রীমৎ সোমানন্দ স্থবির, শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ স্থবির, শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, শ্রীমৎ শ্রদ্ধাতিষ্য স্থবির, শ্রীমৎ উত্তমানন্দ স্থবির, শ্রীমৎ বিমলতিষ্য স্থবির, পুনানিটি নিবাসী শ্রীমৎ কান্তিপাল ভিক্ষু, শ্রীমৎ সুভুতি ভিক্ষু ও শ্রীমৎ বুদ্ধানন্দ ভিক্ষু। সব শিষ্যগণ জ্ঞানী ও শাসনের কল্যাণমিত্র ছিলেন।

তালসরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরসহ আরো পাঁচজন শ্রামণ সদ্ধর্মের নিবেদিত প্রাণ পুণ্যপুরুষ যাদের পদচারণায় অত্র অঞ্চল তথা পুরো বৌদ্ধ সমাজ কৃতার্থ হয়েছে; উনারা হলেন আরিয় মহাস্থবির, নবীন মহাস্থবির, সুপন্ডিত প্রিয়তিষ্য মহাস্থবির, আনন্দ মহাস্থবির ও শ্রীমৎ শ্রদ্ধাতিষ্য মহাস্থবির। প্রয়াত প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের আধ্যাত্মিক কর্মপ্রতিভা অপরিসীম; যারা প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এবং যারা আদর্শ ও জ্ঞানের কথা শুনেছেন তাঁরা সকলে অতি শ্রদ্ধার সাথে তাঁর পূজা করেন। পণ্ডিত ভন্তে জীবিত থাকা ও মৃত্যুকালীন সময়ে সপ্তগ্রাম তালসরা মুচ্ছদ্দীপাড়া, চেনামতি, ওসখাইন, বাথুয়া, বড়িয়া, তিশরী ও রুদুরা গ্রামবাসীদের উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন। বহু বৌদ্ধ গ্রামের সাধারণ লোকেরা এসে এখানে বন্দনা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। প্রজ্ঞাতিষ্য ভন্তে থাকাকালীন প্রতি মাসে অঞ্চলের ভিক্ষুসংঘ নিয়া সংঘদান করা হত। প্রতি দিন অনেক ভক্তবৃন্দ এসে মন্দিরে পুজা দিয়ে যায়। প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও বহুমুখী জ্ঞানের কথা জেনে মানুষ শ্রদ্ধায় আপ্লুত। ভবিষ্যৎ বংশধরকে জ্ঞাত করার জন্য আমার গুরু ভন্তে কর্মবীর বুদ্ধদত্ত মহাস্থবির, প্রয়াত জিনবংশ মহাস্থবিরের শিষ্য কোণ্ডাঞ্ঞো ভিক্ষুর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে অল্প সময়ের মধ্যে ভন্তের জীবনী তালসরা গ্রামের শ্রদ্ধাবান উপাসক পরপারগত সুধাংশুবিমল বড়ুয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করেন। বর্তমান সময়ে মুৎসুদ্দিপাড়া শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের স্মৃতি চৈত্যে পূজা বন্দনা করতে আসলে ভন্তের বিভিন্ন ধরণের ঘটনার কথা শুনে সাধারণের মনে শ্রদ্ধা ও প্রীতি উৎপন্ন হয়। অনেকে তাঁর জীবনী গ্রন্থ আছে কিনা জানতে চায়। পূর্বে প্রকাশিত কোনো জীবনী না থাকাতে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না বিধায় আমাদের সপ্ত গ্রামের বাথুয়া জ্ঞানোদয় বিহারের অধ্যক্ষ মৈত্রীপ্রদীপ শ্রদ্ধেয় সংঘরক্ষিত

মহাস্থবিরের প্রিয় শিষ্য সুমঙ্গল ভিক্ষু ওসখাইন সদ্ধর্মানন্দ বিহারে অবস্থান কালীন তার মনের ভাবটা প্রকাশ করেন পণ্ডিত ভন্তের জীবনীটা পুনঃ প্রকাশের জন্য। ছোট ভিক্ষু হলেও তাঁর লিখার অভ্যাস আছে। আমরা ভিক্ষু সংঘ তাকে লিখার জন্য উৎসাহিত করলাম। সে তখন হতে তালসরা এসে রেবতী বড়ুয়া, প্রদীপ বড়ুয়া, রনধীর বড়ুয়া সবচেয়ে বেশী শ্রদ্ধেয় শাসনমিত্র মহাস্থবির হতে তথ্য সংগ্রহ করে কষ্ট করে একটি জীবনী রচনা করে। বড়ই পরিতাপের বিষয় শারীরিক রোগে আক্রান্ত হয়ে সুমঙ্গল ভিক্ষু অকালে পরলোক গমন করে। তার মৃত্যুতে আমাদের শাসনের অনেক ক্ষতি সাধন হয়েছে। তার স্মৃতি বা কীর্তি থেকে যাবে মানুষের মাঝে।

প্রয়াত সুমঙ্গল ভিক্ষুর মামা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়ার বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর মাধ্যমে সংশোধন ও সংযোজন করে প্রয়াত পণ্ডিত ভন্তের জীবনী রচিত হয়েছে।

সেই পুণ্য পুরুষের জীবনীটা আনন্দ ও শ্রদ্ধাচিত্তে প্রকাশ করার জন্য ধার্মিক উপাসক সরকারী কর্মরত রঞ্জন বড়ুয়া ও তদীয় পত্নী শ্রীমতি ইন্দ্রা বড়ুয়াকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও আর্শিবাদ জানাচ্ছি। রঞ্জন বড়ুয়া যখন প্রজ্ঞাতিষ্য স্মৃতি মন্দিরে প্রব্রজিত হয়েছিলেন তখন এই মহাপুরুষের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয় তাঁরই বহিঃপ্রকাশ ঘটলো তাঁর জীবন-চরিত প্রকাশনার মধ্যমে। আমি রঞ্জন বড়ুয়া ও তার পরিবারের মঙ্গল কামনা করি।

প্রত্যেকে ধার্মিক হউক, দুঃখ হইতে মুক্ত লাভ করুক। বিশ্বের সকল প্রাণী সুখী হইক।

ধর্মমিত্র মহাস্থবির
মহাধ্যক্ষ, চেনামতি সচ্চিদানন্দ বিহার
আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।
ও
অধ্যক্ষ
মেরুল বাড্ডা আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার
ঢাকা।

শাসনধ্বজ প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের জীবন-চরিত

সূচনা

বাঙালি বৌদ্ধদের ধর্ম ও সংস্কৃতির নবজাগরণে যে কয়জন পুরোধা ভিক্ষু এবং গৃহী ব্যক্তিত্বের নাম ইতিহাসের পাতায় রূপালী অক্ষরে লেখা আছে তাঁদের মধ্যে সাধক শ্রেষ্ঠ, আবাল্য ব্রহ্মচারী শাসনধ্বজ পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের নাম অন্যতম। বাঙালি বৌদ্ধরা যখন শিক্ষা-দীক্ষায়, ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-আচরণে, সংস্কৃতি চর্চায় অপরাপর ধর্মাবলম্বীদের চাইতে পিছিয়ে ছিল, বিভিন্ন কুসংস্কারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল, তখনই বাঙালি বৌদ্ধ সমাজগগনে এই ক্ষণজন্মা মহান ভিক্ষুর আর্বিভাব। সমাজ ও সদ্ধর্মের কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির আজীবন কাজ করে গেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত না হয়েও কিভাবে আপন চেষ্টা ও অধ্যবসায়গুণে একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত 'পণ্ডিত' হিসেবে খ্যাতি অর্জন করা যায় প্রয়াত মহাস্থবির মহোদয় তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর নাতিদীর্ঘ জীবন বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত, সুখ-দুঃখে, আবর্তিত হলেও তিনি অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। স্বীয় প্রয়াস ও প্রচেষ্ঠায় তিনি নিজের ঐহিক-পারত্রিক জীবনের যেমন মঙ্গল সাধনে সার্থক হয়েছেন তেমনি সমাজের কল্যাণ সাধনেও সফলতা লাভে সক্ষম হয়েছেন। সত্যিকার অর্থে তাঁর মতো ধীমান, বিনয়ী, ধর্ম-বিনয়ে পরগূ, মিতভাষী, শিক্ষানুরাগী, সমাজহিতৈষী, পণ্ডিত ভিক্ষু বর্তমান সমাজে বিরল। তাঁর নৈতিক আচার-আচরণ, সদ্ধর্মদেশনা সাধারণের কাছে আদর্শ স্থানীয়।

এই পুণ্যপুরুষ পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের পুত জীবন চরিত রচনা করার মতো যোগ্যতা আমার নেই। সপ্তগ্রাম সমিতির অর্ন্তগত বাথুয়া জ্ঞানোদয় বিহারের অধ্যক্ষ আমার পরম শ্রদ্ধেয় উপাধ্যায় বিনয়শীল শ্রীমৎ সংঘরক্ষিত মহাস্থবিরের সাথে এবং ওসখাইন বিহারে অবস্থান করার সময় মহান পণ্ডিত শাসনধ্বজ প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের পুণ্যময় আদর্শ জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে আমি তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত রচনায় উদ্বুদ্ধ হই। এ ব্যাপারে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন তালসরা মুচ্ছদ্দিপাড়া বিবেকারাম বিহারের অধ্যক্ষ পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ শাসনমিত্র মহাস্থবির, তালসরা

আনন্দারাম বিহারের অধ্যক্ষ পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ ধর্মমিত্র মহাস্থবির, চেনামতি গ্রামের বাবু রঞ্জন বড়ুয়া সহ এতদঞ্চলের ভিক্ষুসংঘ ও নেতৃস্থানীয় দায়ক-দায়িকাবৃন্দ। এ মহান ভিক্ষুর জীবন-চরিত রচনা করতে গিয়ে ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'শাসনধ্বজ শ্রীমৎ প্রজ্ঞাতিষ্য শবদাহ ও স্মৃতিরক্ষা সমিতির কার্য্য-বিবরণ' এবং কোন্ডাঞ্ঞো ভিক্ষু রচিত 'মহাপণ্ডিত শাসনধ্বজ প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য' (প্রকাশিত ১৯৮০) পুস্তিকা এবং স্থানীয় বয়স্ক ভিক্ষু ও নেতৃবৃন্দ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। এসব তথ্য ধারাবাহিকভাবে সজ্জিত করে আমি এ পুণ্যময় জীবন-চরিত রচনা করার প্রয়াস পেয়েছি। এর কিছুমাত্র সাফল্য যদি হয়ে থাকে তার কৃতিত্ব অনুপ্রেরণাদানকারীদের আর সকল ব্যর্থতা আমার।

জন্ম

প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্য কৃষ্টি আর সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ চট্টগ্রাম, সেখানে প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার অন্যতম খ্যাতনামা বিদ্যাপীঠ পণ্ডিত বিহার অবস্থিত ছিল বলে গবেষকগণ ধারণা করেন। প্রাকৃতিক অনুপম সৌন্দর্য্যে সমাকীর্ণ বন্দর নগরী চট্টগ্রাম শহরের অনতিদুরে আনোয়ারা থানার পূর্ব-উত্তর সীমান্তে অবস্থিত তালসরা একটি ক্ষুদ্র অথচ বর্ধিষ্ণু বৌদ্ধ গ্রাম। চানখালী ও মুরালী ঘাটের পশ্চিম তীরে অবস্থিত এ ক্ষুদ্র জনপদটি ধন-ধান্যে সমৃদ্ধ। এ গ্রামে বহু খ্যাতিমান পুরুষের জন্ম। এ গ্রামের সুখীরাম বড়ুয়া ও তাঁর স্ত্রী বিন্দুমতি বড়ুয়া সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে সংসার ধর্ম প্রতিপালন করে বসবাস করতেন। তাঁরা উভয়ে ছিলেন সদ্ধর্মের প্রতি অতীব শ্রদ্ধাশীল; প্রতিদিন দু'বেলা উপাসনা, উপোসথাদি প্রতিপালন ইত্যাদি পুণ্যময় কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে তাঁদের জীবন অতিবাহিত হতো। সুখীরাম বড়ুয়া ও বিন্দুমতি বড়ুয়ার এক কন্যা বাসনা ও এক পুত্র বিশ্বম্ভর। বাসনা বড়, বিশ্বম্ভর কনিষ্ট। পুত্রের জন্মে মাতা-পিতা আনন্দে আত্মহারা। বিশ্বম্ভরের জন্ম ৩ ফাল্গুন ১২৭৮ বঙ্গাব্দে, ইংরেজী ১৮৭১ সনে। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। সুখীরাম বিপুল অর্থ-বিত্তের অধিকারী না হলেও তার আর্থিক অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল ছিল। দুই সন্তানসহ চারজনের সংসার অতি সুখেই কাটছিল। মাতা-পিতা ও সন্তানদ্বয় নিয়ে আনন্দে দিন অতিবাহিত করছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস বিশ্বম্ভরের বয়স যখন মাত্র দেড় বছর তখনই তাঁর পিতা সুখীরাম বড়ুয়া

হঠাৎ রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মা বিন্দুমতি দুই ছোট সন্তান নিয়ে অতি কষ্টে জীবন যাপন করতে লাগলেন। মায়ের অপ্রমেয় স্নেহ আর ভালোবাসায় অবুঝ সন্তানদ্বয় বড় হতে লাগলো। দুঃখের মাঝেও মায়ের সান্তনা যে, বুক জুড়ে তাঁর সন্তানদ্বয় তো রয়েছে। সন্তানদ্বয়ের মুখ দেখে বিন্দুমতি সকল দুঃখ-কষ্টকে হাসিমুখে বরণ কর নিয়েছিলেন।

বাসনার বয়স যখন ১২ বছর এবং বিশ্বম্ভরের বয়স যখন ৩ বছর তখন তাদের একমাত্র আশ্রয় মাতৃদেবী বিন্দুমতি দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। এতিম হয়ে পড়লো বাসনা ও বিশ্বম্ভর। লোকে বলে, বিপদ যখন আসে চারদিক থেকে আসে। কর্মের বিপাক খণ্ডন করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। মাতৃ পিতৃহীন বাসনা আর বিশ্বম্ভর যেন অথৈ সাগরে নিমজ্জিত। কে তাদের দেখা-শুনা করবে ? কে নেবে ভরণ-পোষণের ভার ? এই এতিম দুঃস্থ ভাইবোনের জীবনে নেমে আসলো ঘোর অমানিশা। গ্রামবাসী নেতৃবৃন্দ এবং তালসরা আনন্দরাম বিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ কর্ণধন মহাস্থবিরের সাহায্যে তারা জীবন পথে ক্ষীণ আলোর সন্ধান পেল। দুঃখে-কষ্টে তাদের জীবন অতিবাহিত হতে লাগলো। বাসনা ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পণ করলো।

বাসনার বয়স ষোড়শ বৎসর। রূপে গুণে অনিন্দ্য সুন্দরী। তার আচার-ব্যবহার অত্যন্ত মার্জিত; সকলে বিমোহিত। কনিষ্ট বিশম্ভরের বয়স তখন ১২ বছর। সেও অত্যন্ত শান্ত। প্রতিদিন বিহারে গিয়ে বিহার পরিস্কার করা, ফুল দিয়ে বুদ্ধ পূজা করা, ভিক্ষুর পরিচর্যা করা তার নিত্য দিনের অভ্যাস। বাসনা ও বিশ্বম্ভর গ্রামবাসী ও বিহারাধ্যক্ষের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন। বাসনা ছোটভাই বিশম্ভরকে পিতার আদর আর মায়ের স্নেহ দিয়ে লালন পালন করতে লাগল। অত্যন্ত রূপবতী যুবতী বাসনা ভাইয়ের ভবিষ্যত চিন্তা করে জীবনে আর সংসারধর্ম গ্রহণ করেননি। ভাইয়ের ভাবী জীবনকে উজ্জ্বল ও কল্যাণময় করার প্রত্যয়ে সারাজীবন চিরকুমারী থেকে এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। এই মহিয়সী নারীর অবদান বিশ্বম্ভর বড়ুয়ার ভাবী জীবনকে নিঃসন্দেহে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত করেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই বিশ্বম্ভর বড়ুয়াই আমাদের আলোচিত পরবর্তীকালে সমাজ-সদ্ধর্মের ধ্বজাধারী ভিক্ষুকূল গৌরব, সর্বজন নন্দিত সাংঘিক ব্যক্তিত্ব শাসনধ্বজ পণ্ডিত শ্রীমৎ প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির।

অতঃপর বিশ্বম্ভর বড়ুয়ার বয়স যতই চন্দ্রগর্ভের ন্যায় বাড়তে লাগল,

জ্ঞান পিপাসাও তার ততই প্রবল হতে লাগল। জ্ঞান সমুদ্র মন্থন করার জন্য তাঁর অতৃপ্ত মন অস্থির হয়ে উঠল। তিনি বুঝতে পারলেন জ্ঞান অর্জন করা তত সহজ নয়। তাঁর জন্য চাই নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচর্য জীবন ও নিপুণ সাধনা। প্রত্যক্ষানুভূতি ছাড়া জ্ঞানবস্তুর আস্বাদন করা আকাশ কুসুম চিন্তা মাত্র। এ জ্ঞান ভাণ্ডার লাভ করতে হলে, চাই বৈরাগ্য জীবন। বৈরাগ্য ব্যতীত জ্ঞান বিষয়ে উপলব্ধি করা ও দুঃখ হতে নিবৃত্তি লাভ করা মোটেই সম্ভব নয়। তাই কুমার বিশ্বম্ভর সিদ্ধার্থের ন্যায় সংসার ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষা নেওয়ার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে তাঁর একমাত্র দিদি বাসনা বড়ুয়াকে হৃদয়ের অনুভূতি ও মনের অভিলাষের কথা বিনয়ের সাথে ব্যক্ত করলেন। তখন দিদি স্নেহের একমাত্র ছোট ভাইয়ের আশার আবদেন জ্ঞাত হয়ে প্রথমে খুবই হতবিহ্বল হয়ে চিন্তান্বিত হলেন। কিন্তু পরে আনন্দচিত্তে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। দিদির কষ্ট হলেও সহজে এ প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন, কারণ তিনিও ধর্মের মধুর রস আস্বাদন করে জীবনকে মানব কল্যাণে নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি এক মহিয়সী ধার্মিক মহিলা ছিলেন যা নারী জাতির অহংকার। তিনিও মনস্থ করলেন সংসার চক্রে আর কামনা বাসনায় লিপ্ত হবেন না। তাঁর এ দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় তিনি অটুট ছিলেন। সারা জীবন চির কুমারী থেকে স্বীয় জীবনকে ধর্ম চর্চা ও মানব সেবায় নিয়োজিত রেখে এক অনবদ্য নজির স্থাপন করেছেন। আজ তারই ফলশ্রুতিতে বাঙালি বৌদ্ধ সমাজ তথা সর্বস্তরের জনসাধারণ উপকৃত হয়েছেন, যা এক বাক্যে স্বীকার করতে হয়। সেই মহীয়সী নারী শ্রীমতি বাসনা বড়ুয়া পরবর্তী সময়ে স্বীয় জীবন-যৌবনের সকল ভোগ-লালসা, কামনা-বাসনাকে বিসর্জন দিয়ে সারাটা জীবন ধর্মীয় অনুশীলন, ধর্মীয় সেবামূলক কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োজিত ও মানব কল্যাণে আত্ম উৎসর্গ করে নারী জাতির এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

বিশ্বম্ভর বড়ুয়া অর্থাৎ পরবর্তী সময়ের পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের জন্মজনপদ নিয়ে কিছুটা মতদ্বৈত শোনা যায়। কেউ কেউ বলেন, তাঁর জন্মস্থান পটিয়া থানার অর্ন্তগত পিংগলা গ্রামে। অনেকের মতে তাঁর মাতুলালয় ছিল পিংগলায়। ফলে ছোট বয়সে তিনি প্রায় সময় পিংগলা মামার বাড়ি যেতেন এবং দীর্ঘসময় কাটাতেন। এ সূত্র ধরে হয়ত তার জন্মস্থান পিংগলা বলে কারো কারো ধারণা হতে পারে। মহাস্থবিরের শবদাহ ও স্মৃতিরক্ষা সমিতির কার্য বিবরণে দেখা যায় পিংগলাসহ পার্শ্ববর্তী গ্রামে বহু প্রবীন ও প্রথিতযশা নেতৃবৃন্দ তাঁর শবদাহ অনুষ্ঠানে যোগদান করে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সেই কার্যবিবরণে মহাস্থবিরের জন্মস্থান তালসরা বলে উল্লেখিত হয়েছে। এতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্যের জন্মজনপদ আনোয়ারা থানার তালসরা গ্রাম। এ নিয়ে কোনো বির্তক বা সংশয়ের অবকাশ আছে বলে মনে হয় না।

প্রব্রজ্যা লাভ

১৮৮৩ ইংরেজী, ১২৯৯ বাংলা, ১৮০৬ শকাব্দ বাঙালি থেরবাদী বৌদ্ধদের উত্তরসুরী তালসরা আনন্দারাম বিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ কর্ণধন স্থবিরের নিকট দ্বাদশ বছরের কুমার বিশ্বম্ভর বড়ুয়াকে প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে আলোচনার পর সিদ্ধান্তে গৃহীত হলো যে, এক শুভদিন- শুভক্ষণ দেখে এবং দায়ক দায়িকাদের আহ্বান করে তাঁকে প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষা প্রদান করা হবে। স্থবির মহোদয় বালক বিশ্বম্ভর বড়ুয়ার এ মহতী আশা-আকাঙ্খা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে সানন্দ চিত্তে সাধু সম্মতি জানালেন। কারণ শাস্ত্রে বলে, "দূল্লভঞ্চ পব্বজ্জং; প্রব্যজ্যা জীবন লাভ করা অতি দুর্লভ"। এ দুর্লভ জীবন লাভ করা তত সহজ নহে, দুর্লভ অথচ নির্মল পবিত্রময় প্রব্যজ্যা লাভ করতে হলে চিত্ত সংকল্পবদ্ধ ও দৃঢ় প্রত্যয় থাকতে হবে। কর্তব্য সাধনে পথ কদাচ কুসুমাস্তীর্ণ নহে বরং কন্টকাকীর্ণ। তাই বীর্যবান মহাত্যাগী বীর পুরুষেরা শত সহস্র বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে স্বীয় লক্ষ্য পথে অগ্রসর হন, অর্ধ পথে তারা কখনো পিছপা হন না। দুঃখ জগতের স্বভাবজাত ধর্ম। এ ভব চক্রের তৃষ্ণার হেতুতে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে অপরিমেয় দুঃখ ভোগ করতে হয়। তাই এই ক্ষণজন্মা বালক "বিশ্বম্ভর" বারংবার দিদি বাসনা বড়ুয়াকে তাগিদ দিতে লাগলেন। তৎসঙ্গে পরম শ্রদ্ধেয় তালসরা বিহারাধ্যক্ষ ভান্তেকেও পুনঃ পুনঃ তাঁর মনের বাসনা ব্যক্ত করে প্রব্রজ্যা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করতে লাগলেন।

অতঃপর ১৮০৬ শকাব্দে, ১৮৮৩ ইংরেজী, ১২৯৯ বাংলা এক শুক্লপক্ষে গ্রামের সকল ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের উপস্থিতিতে তালসরা আনন্দরাম বিহারের বিহারধ্যক্ষ শ্রীমৎ কর্ণধন স্থবির মহোদয় বালক বিশ্বম্ভর বড়ুয়াকে প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষা প্রদান করেন। আর তখন এ পুণ্য পুরুষের নাম রূপান্তরিত হয়ে শ্রমণ প্রজ্ঞাতিষ্য নামে অভিহিত করা হয়। বিশ্বম্ভরের এখন নতুন নাম হলো; নব জন্ম হলো। নব দীক্ষিত শ্রমণ এখন অতি আনন্দের সহিত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। শ্রমণ প্রজ্ঞাতিষ্য মহামতি বুদ্ধের প্রতি এবং তাঁর গুরুদেব পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ কর্ণধন স্থবিরের

প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাশীল হয়ে এভব দুঃখ কাতর সত্ত্বদের দুঃখ পরিত্রাণের মানসে ও তিনি স্বয়ং মোক্ষলাভ করার নিরিখে মায়ার জাল ছিন্ন করে গৈরিক জীবনকে আলিঙ্গন করে নিলেন। লৌহ পিঞ্জর ছেদন করে মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় পরম সুখ ও শান্তি উপভোগ করতে লাগলেন। শ্রামণ্য ধর্ম্মে দীক্ষা নেওয়ার পর তাঁর অন্তর অফুরন্ত প্রীতিরসে ভরপুর হয়ে উঠল। তিনি প্রব্রজ্যা ধর্মের উপকারিতা উপলব্ধি করতে লাগলেন। এভাবে ক্রমান্বয়ে গুরুর সান্নিধ্যে ধর্ম বিনয় শিক্ষা একাগ্র চিত্তে গ্রহণ করতে লাগলেন এবং গুরুর প্রতি শিষ্যের কর্তব্য ও সমস্ত ব্রত কর্মাদি কায়মনোবাক্যে শ্রদ্ধাপ্লুতচিত্তে সম্পাদন করতে লাগলেন। এভাবে তিনি তথায় এক বৎসর অতিবাহিত করেন।

অতঃপর তিনি একদিন চিন্তা করলেন যে, আমার আরো গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তাঁর স্মরণ হলো সিদ্ধার্থ গৌতমের কথা। তিনিও জ্ঞান অন্বেষণের জন্য অনেক গুরুর সন্ধানে বাহির হয়েছিলেন। তাঁর জ্ঞান অর্জনের মহৎ অভিলাষ স্থিমিত হলো না। সত্যের সন্ধানে প্রজ্ঞাতিষ্য শ্রামণ গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করতে লাগলেন। সন্ধান পেলেন আর এক ক্ষণজন্মা মহাগুরুদেবের। তিনি হলেন বাঙালি থেরবাদীদের কাণ্ডারী দ্বিতীয় সংঘরাজ আচারিয় শ্রীমৎ পূর্ণাচার চন্দ্রমোহন মহাস্থবির মহোদয়। এ ক্ষণজন্মা পুণ্যপুরুষের সান্নিধ্যে অবস্থান করে ধর্ম-বিনয় শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন। গুরু শ্রীমৎ কর্ণধন স্থবির আনন্দ চিত্তে অনুমতি প্রদান করলেন।

সংঘরাজ পূর্ণাচার চন্দ্রমোহন মহাস্থবিরের সান্নিধ্যে

১৮০৭ শকাব্দের কথা, তখন বাংলার উজ্জ্বল নক্ষত্র বাঙালি বৌদ্ধদের অন্যতম দিকপাল আচার্য প্রধান ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ তদানীন্তন বঙ্গীয়বাসীর সর্ব্বোচ্চ ধর্মীয় গুরু, বাঙালি বৌদ্ধদের থেরবাদীর ধারক বাহক দ্বিতীয় সংঘরাজ আচারিয় পূর্ণাচার চন্দ্রমোহন মহাস্থবির মহোদয় পটিয়া থানার ঊনাইনপুরা লংকারাম বিহারে অবস্থান করতেন। তাঁর সুনাম, যশ, খ্যাতি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। একদিন শ্রামণ প্রজ্ঞাতিষ্য এ মহা পণ্ডিতের সান্নিধ্যে গিয়ে

নতশিরে বন্দনা নিবেদনান্তে এক পার্শ্বে উপবেশন করে করজোড়ে সবিনয়ে তাঁর মনের অভিলাষের কথা ব্যক্ত করলেন। পরস্পর পরস্পরের প্রতি কুশলাকুশল বিনিময়ের পর সংঘরাজ আচারিয় শ্রীমৎ পূর্ণাচার মহাস্থবির সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। তখন শ্রামণ প্রজ্ঞাতিষ্য সেখানে অবস্থান করতে লাগলেন। আর গুরুর স্নেহের পরশ পাওয়ার অধীর অপেক্ষা করতে লাগলেন। এভাবে সেখানে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। এদিকে আচারিয় পূর্ণাচার মহাস্থবির শ্রমণের প্রতি বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে জ্ঞাতে অজ্ঞাতে অনেক পরীক্ষা-নীরিক্ষা নিতে লাগলেন। মানুষের কতেক বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। বিশেষত একজন সৎ মানুষ হতে চাইলে যে গুণাবলী থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়; তন্মধ্যে ত্রয়োদশ বয়সী শ্রামণ প্রজ্ঞাতিষ্যের সবগুলি ছিল। তাঁর ছিল অসাধারণ ত্যাগ-তিতিক্ষা, সততা, ধৈর্য্য ও সাহস। এসব গুণাবলী প্রকট ছিল বিধায় তিনি আচারিয় শ্রীমৎ পূর্ণাচার চন্দ্রমোহন মহাস্থবিরের একজন যোগ্যতম শিষ্যত্ব লাভ করার গৌরব অর্জন করেছিলেন।

অতঃপর এক শুভদিনে শুভক্ষণে পরম গুরু শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ পূর্ণাচার চন্দ্রমোহন মহাস্থবির মহোদয় তাঁকে পুনঃ শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষা প্রদান করেন। যোগ্য ব্যক্তির সাথে যে আর একজন যোগ্য ব্যক্তির মিলন ঘটে এটা স্বাভাবিক। শ্রামণ প্রজ্ঞাতিষ্য নির্বাণ লাভের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পরম সত্য ধর্মের আশ্রয়ে জীবন উৎসর্গ করে ধন্য ও কৃতার্থ হলেন। এ মহা গুরুর সান্নিধ্য লাভে তাঁর উৎসাহ অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলো। তিনি প্রব্রজ্যা জীবনের রীতি-নীতি, ব্রত কর্মাদি ও ধর্মশিক্ষা চর্চাতে মনোযোগী হলেন। তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রাতিমোক্ষ শিক্ষা সমাপ্ত করে উত্তমরূপে শ্রামণ্য ধর্মে রমিত হলেন। তাঁর অসাধারণ কর্ম প্রতিভায় আচারিয় গুরু শ্রীমৎ পূর্ণাচার চন্দ্রমোহন মহাস্থবিরের মন অল্পদিনের মধ্যে জয় করে কৃতিত্বের অধিকারী হলেন। এমনকি তিনি ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদের প্রতি লেশমাত্র অবহেলা করতেন না। এটাই হলো প্রতিভাবান পুরুষের অন্যতম লক্ষণ। এ তমসাচ্ছন্ন ধরাতলে অনেক ধরণের মানুষের আর্বিভাব ঘটে থাকে। তৎমধ্যে কেউ লোভী, কেউবা ভোগী, কেউ মহাত্যাগী। এদের মধ্যে শ্রমণ প্রজ্ঞাতিষ্য হলেন মহাত্যাগী ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। শ্রামণ প্রজ্ঞাতিষ্য নৈর্বাণিক ধর্ম লাভের ঐকান্তিক কামনায় পরম সদ্ধর্মের আশ্রয়ে জীবন উৎসর্গ করে ধন্য ও কৃতার্থ হলেন। শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা ও শ্রামণের ব্রতকর্ম নীতিমালা নিপুনভাবে অধ্যয়নে আচারিয় গুরুদেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তিনি অল্প সময়ের মধ্যে

তাঁর সদাচারগুণে গুরুভান্তে তথা অপরাপর সকলের প্রিয়ভাজন হলেন।

অতঃপর বৎসরের পর বৎসর অতিক্রান্ত হলো। এভাবে বিংশতি বৎসরে পদার্পন করে পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলেন তিনি। কিন্তু পূর্বজন্মের কুশল পারমিতার প্রভাবে যৌবনের তারুণ্যতাকে পরাস্ত করে নির্বাণ সাধনায় দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। ললিত যৌবনের বিলাস ব্যসনের মদিরতা তাঁর বিরাগপ্রবণ চিত্তকে স্পর্শ করতে পারল না। তাঁর অভিলাষ উপসম্পদা লাভ করা। তৎপর তিনি এক দিবসে পরম গুরু আচারিয় শ্রীমৎ পূর্ণাচার চন্দ্রমোহন মহাস্থবিরের নিকট গিয়ে বিনয়ের সহিত তাঁর মনের বাসনা প্রকাশ করলেন। তখন আচারিয় গুরুদেব তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা করার পর আনন্দিত হয়ে উপসম্পদা প্রদানের সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। অতঃপর ১৮৯১ ইংরেজী, ১২৯৮ বাংলা, ১৮১৫শকাব্দের এক শুভ দিনে সত্য সন্ধানী প্রজ্ঞাতিষ্য শ্রামণের পরিপূর্ণ বয়সে পটিয়া থানার অধীনস্থ ঠেগরপুণি গ্রামের উদক সীমায় সংঘরাজ শ্রীমৎ পূর্ণাচার চান্দ্রমোহন মহাস্থবিরের উপাধ্যায়ত্বে শুভ উপসম্পদায় অভিষিক্ত করা হন। তথায় তদানীন্তন অনেক গুণী জ্ঞানী স্থবির মহাস্থবিরগণ ও সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকা মণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন। তৎপর তাঁর নাম হলো ভিক্ষু প্রজ্ঞাতিষ্য। সেদিন ভিক্ষু প্রজ্ঞাতিষ্যের জীবনে এক অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক দিন।

শীল সমাধি ও প্রজ্ঞার অনুশীলন

নতুন জন্মলাভী প্রজ্ঞাতিষ্য ভিক্ষু বুদ্ধ প্রশংসিত দেব দুর্লভ পবিত্রময় ভিক্ষু জীবন স্বেছায় বরণ করে প্রীতি সাগরে সাঁতার কাটছেন এবং ধর্মরস আস্বাদনে অভিরমিত হলেন। তিনি প্রকৃত সারকে মনপ্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। বুদ্ধের অমৃতময় বাণী

"সারঞ্চ সারতো ঞত্বা, অসারঞ্চ অসারতো,
তে সারং অধিগচ্ছান্তি, সম্মাসংকপ্পা গোচরা"

অর্থাৎ সারকে সার রূপে এবং অসারকে অসাররূপে যথাযথ ধারণা থাকাই প্রকৃত জ্ঞানীর লক্ষণ। যাঁরা শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা সাধনায় বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন সার ও পরমার্থ সারে অধিষ্ঠিত, তারাই পরম নির্বাণ লাভে সক্ষম হন। তিনি নিখুঁতভাবে বিনয়শীল, ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ শীল, সংবরণ শীল, সমাধিস্কন্ধ ও

প্রজ্ঞাস্কন্ধ সর্ম্পকে গুরুর নিকট হতে অধীর আন্তরিকতার সাথে যাঞ্ছা করতঃ শিক্ষা গ্রহণ করে তা অনুশীলন করতেন। তাঁর ধ্যানধারণা ও চিন্তা চেতনা ছিল উমুক্ত। তিনি পরম আচারিয় গুরুর মন জয় করে ভূয়সী প্রশংসিত হন। অসাধরণ গুণসম্পন্ন উপযুক্ত গুরুর যোগ্যতম শিষ্য হিসাবে সর্বত্র পরিচিতি লাভ করে সকলের প্রিয়ভাজন হলেন। তৎপর সাধক হিসেবে ক্রমশঃ খ্যাতি লাভ করতে লাগলেন। মুধর বাক্যালাপে এবং তাঁর দর্শনে মানুষ আকৃষ্ট হতেন। সর্ব্বত্র তাঁর সুনাম, সুখ্যাতি ও যশঃকীর্তি ব্যাপৃত হলো অসংখ্য ভক্তবৃন্দের হৃদয় মন্দিরে প্রজ্ঞাতিষ্যের নাম। তিনি মহামতি বুদ্ধের অমোঘ বাণী দ্বারা মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষকে সম্যকদৃষ্টিতে ধাবিত করতেন। তিনি কোনো মানুষের প্রতি রাগান্বিত ভাবাপন্ন হয়ে বিবাদ করেছেন এমন নজির নেই। রাগ দ্বেষ মোহ হতে উর্ধ্বে থেকে তিনি নৈর্বাণিক সাধনায় আত্মমগ্ন থাকতেন। তাঁর চলাফেরা ছিল ধীর মন্থর গতিতে। সবসময় গুরুগাম্ভীর্য ভাবাপন্ন ও মৃদুভাষী ছিলেন। মৃদু হেসে মানুষকে সহজে আপন করতেন । তাঁর কায় শান্ত, বাক্য শান্ত, মন শান্ত, চিত্ত সুষমান্বিত; একাগ্র অচঞ্চল । তাঁর সবকিছু আচরণ শোভনীয়, ও বরণীয়। তরুণ হলে কি হবে, তথাগত বুদ্ধ প্রবর্তিত অরহৎ ধ্বজা পরিহিত প্রজ্ঞাতিষ্য আপন শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা বলে মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় এই শাসন সদ্ধর্মকে অর্পুব অফুরন্ত শ্রীবৃদ্ধি করেছেন। তাই তো জগতে এইরূপ মহজ্ঞানী মহাপুরুষের আর্বিভাব অতীব দুর্লভ। সকল স্থানে তাদৃশ পুণ্যপুরুষ জম্ম গ্রহণ করেন না। যে দেশে, যে বংশে এরূপ পুণ্যশ্লোক ক্ষণজম্মা মহাসাধক ত্যাগদীপ্ত পুরুষ জম্ম পরিগ্রহ করেন সে দেশ, সে সমাজ, সে জাতি ধন্য ও সমুজ্জ্বল হয়। সেই কুল মহান সমুন্নত ও গৌরবান্বিত হয়। সুতারাং এই অশান্ত জগতে এরূপ ক্ষণজম্মা মহাপুরুষের জন্মগ্রহণ নিতান্ত প্রয়োজন। গুরু শিষ্য উভয়ের অন্তরজগতে পরস্পর পরস্পরের প্রতি মধুর প্রীতিভাব, অন্তরঙ্গতা ও সহৃদয়তা বিরাজ করত। একে অন্যের নিকট কুশালাকুশল প্রীতিভাবের বিনিময় করতেন। তিনি অনুভব করতে লাগলেন, ত্যাগেই পরম শান্তি। নিজেকে মনে করলেন পরম স্বাধীন। উপভোগ করতে লাগলেন গৈরিক জীবনের অনাবিল সুখ শান্তি। মগ্ন হতেন ধ্যান সাধনায়।

শ্রীলংকা গমন

সদা জাগরমানানং অহোরত্তনুসিক্খিনং
নিব্বানং অধিমুত্তানং অথং গচ্ছন্তি আসবা।

দ্বিন্নং ধুরঞ্চ। যথা- গন্থ ধূরঞ্চ ও বিপস্সন ধূরঞ্চ; 'বুদ্ধ শাসনে' মার্গ বা রাস্তা প্রধানতঃ দু'প্রকার , যথা গ্রন্থগত ধূর ও বিদর্শনগত ধূর । প্রথম জীবনে আচারিয় শ্রীমৎ পূর্ণাচার মহাস্থবিরের নিকট ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণা পূর্ণ হয়নি। অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার তাঁর তীব্র বাসনা। জ্ঞান অর্জন করে বাঙালি বৌদ্ধদের ঘরে ঘরে ধর্মরস পৌছাবার একান্ত ইচ্ছা। আর সেই প্রবল ইচ্ছা-উদ্দীপনা নিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের আশায় শ্রীলংকা গমনের সংকল্প করলেন তরুণ ভিক্ষু প্রজ্ঞাতিষ্য।

১৮৯৪ ইংরেজী, ১৩০১ বাং আচারিয় শ্রীমৎ পূর্ণাচার চন্দ্রমোহন মহাস্থবিরের সর্ব্বাত্নক সহযোগিতায় ভিক্ষু প্রজ্ঞাতিষ্য জ্ঞান আহরণ করার নিরিখে বৌদ্ধ প্রতিরূপ দেশ লংকার উদ্দ্যেশ্যে বাংলাদেশ ত্যাগ করেন। তিনি শ্রীলংকায় উপনীত হলেন। এখানকার ধর্মীয় পরিবেশ, গৃহী ও ভিক্ষুসংঘের মধ্যে অপূর্ব ধর্মীয় অনুভূতি অবলোকন করে অভিভূত হলেন। দূর্লভ রত্ন লাভের প্রত্যাশায় তাঁর এ অভিযান, তদভাবভাবনায় তিনি সদা নিমগ্ন। সেই সত্য সন্ধানে উদগ্রীব হয়ে আছে তাঁর মনপ্রাণ। তাঁকে অতিক্রম করতে হবে সুদীর্ঘ পথ। এ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তিনি পাগল হয়ে উঠলেন। লংকাভূমির প্রকৃতির লীলা-নিকেতন, মনোরম নীলিমা সমাকীর্ণ সরসী-শোভন, মনোহর পুস্পদ্যোন পরিশোভিত, সুচারু হেমরাজী সমলংকৃত, অনুপম রাজশ্রীমণ্ডিত ও সমৃদ্ধ এবং ত্রিপিটক শাস্ত্র মন্থনের নিরিবিলি উত্তম পরিবেশ, শিক্ষায় সমাদৃত জাতি, এই সব গুণাবলী পরিদৃষ্ট হলো তাঁর, তথায় তাঁর মন-প্রাণ অতিশয় মিশে গিয়ে প্রশান্তির আলোকে আশ্বস্ত হলেন।

পরন্তু,তিনি তথাকার প্রসিদ্ধ পরিবেণে ত্রিপিটকধর শাস্ত্রজ্ঞ শ্রীমৎ উপসেন মহাস্থবির ও শ্রীমৎ সুমঙ্গল মহাস্থবিরের নিকট হতে ত্রিপিটক অধ্যয়ন করেন। তাঁর অসাধারণ আত্নপ্রত্যয়, দৃঢ-পণের ভিত্তিমূলে চিত্তকে করলেন স্থির অচঞ্চল, তিনি হলেন হতাশামুক্ত ক্ষণজম্মা এক বীর্য্যবান পুণ্যপুরুষ; তিনি অচিরেই সিংহলী ভাষা ও পালি ভাষা আয়ত্ত করে ত্রিপিটক শাস্ত্রসহ

অট্‌ঠকথা অধ্যয়ন করেন। তাঁর ধী শক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। খুব কম সময়ের মধ্যে তিনি পাঠ্যবিষয় অধিগত করতে সক্ষম হন। সর্বত্র ভিক্ষু প্রজ্ঞাতিষ্যের সুনাম, সুযশ এবং সুখ্যাতি বর্ধিত হলো। অন্তরে স্ফুরিত হলো বিদ্যুৎ ঝলক, প্রাণে জাগলো পুলক-শিহরণ। এভাবে তিনি লংকায় কয়েক বৎসর অতিবাহিত করলেন। তথাকার সরকারী বেসরকারী উচ্চ পদস্থ মহল এবং লংকাবাসীর স্থবির মহাস্থবির ও সংঘনায়কদের সহিত নিবিড় আন্ত রিকতা গড়ে উঠল। সদ্ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠতা, শীলানুশীলনে একাগ্রতা, ধর্মবিনয়ে ঐকান্তিক আস্থা সর্বোপরি সকলের প্রতি অমায়িক ব্যবহার ইত্যাদি বহুবিধ গুণ প্রজ্ঞাতিষ্যের মধ্যে বিরাজমান দেখে লংকাবাসী ভিক্ষুসংঘ এবং দায়ক-দায়িকাবৃন্দ অভিভূত হয়েছিলেন এবং তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় আপন করে নিয়েছিলেন। কয়েক বছর এখানে ধর্মবিনয় অধ্যয়ন শেষে তাঁর জননী জন্মভূমি বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা জাগ্রত হলো। তিনি ত্রিপিটক শাস্ত্রসহ স্বদেশে ফিরে আসলেন। তখনকার সময়ে বহুগুণে গুণান্বিত খ্যাতি সম্পন্ন প্রজ্ঞাতিষ্যের আগমন বার্তা সর্বত্র প্রচারিত হলে অসংখ্য ভক্তবৃন্দসহ স্বজনদের দেহ-মন শ্রদ্ধায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। ধীমান প্রজ্ঞাতিষ্য স্বদেশে এসে তাঁর অর্জিত জ্ঞান বিদ্যার দীপশিখা বাঙালি বৌদ্ধদের প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছাতে লাগলেন। তিমিরাচ্ছন্ন সমাজের অবিদ্যা ও অন্ধ কুসংস্কার দুরীভূত করার অভিপ্রায়ে দৃঢ় তিনি। অতঃপর ক্ষণজন্মা মহিমান প্রজাতিষ্যের ছোঁয়াতে বাঙালি বৌদ্ধ জাতির অর্ন্তর ভূবনে সত্যধর্মের প্রত্যায়িত বীজ বপিত হলো। শিক্ষা সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রতি অটল বিশ্বাস নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধির শক্তিতে হৃদয়ঙ্গমে সঞ্চারিত হয়ে পাপের প্রতি ভয় এবং পুণ্যের প্রতি প্রবল শ্রদ্ধা ও ধর্মের প্রতি অটল বিশ্বাস বর্ধিত হতে লাগলো। ধন্য হলো মাতৃভূমি, আনন্দে উচ্ছ্বাসিত হলেন তাঁর গুরুদেব আচার্য পূর্ণাচার মহাস্থবির।

দ্বিতীয়বার লংকা গমন ও ধাতু নিধান

জ্ঞান সাগরে যাঁরা প্রবিষ্ট হয়েছেন, জ্ঞানের মহাস্বাদ কিরূপ তা একমাত্র তাঁরা জানেন। ভ্রমর যেমন ফুলের মধুর গন্ধে আকুল হয়ে ছুটাছুটি করে, তেমনি ক্ষণজন্মা মহীয়ান পুণ্যপুরুষরাও জ্ঞান আহরণার্থে আকুল ও বিহ্বল হয়ে পড়ে। মাতা পিতার অন্তরে সন্তানের চাওয়া পাওয়ার কোনো অন্ত

নেই, অনুরূপভাবে জ্ঞানপিপাসুর জ্ঞান আহরণের ইচ্ছার শেষ নেই। দীপ্তমান ভিক্ষু প্রজ্ঞাতিষ্য ত্রিলোক শাস্তার প্রবর্তিত নৈর্বাণিক ধর্ম আরো অধিক, আরো বেশি অধিগত করার অদম্য আকাঙ্খায় পুনঃরায় বৌদ্ধ প্রতিরূপ দেশ শ্রীলংকায় গমন করেন। এটা হলো তাঁর দ্বিতীয়বার লংকা গমন। তথায় তিনি সুদীর্ঘ বৎসরাবধি অবস্থান করতঃ ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে পালি সাহিত্যে প্রভূত পাণ্ডিত্যের অধিকারী হলেন। তাঁর অসাধারণ গুণপ্রভায় বিমুগ্ধ হয়ে তথাকার পণ্ডিতমহল 'সম্মান সনদ' প্রদান করেন। তখন লংকাবাসীরাও প্রজ্ঞাতিষ্যের দেশিত বুদ্ধবাণীর অমৃত পিযুষ ধারায় প্লাবিত করে ধন্য করেছেন নিজেদের জীবনকে। বুদ্ধের আদর্শে একনিষ্ট সাধক নির্জনপ্রিয় মঞ্জুপ্রিয় প্রজ্ঞাতিষ্য তাঁর জননী জন্মভূমি, এই তিমিরাচ্ছন্ন মোহান্ধভুমি বঙ্গদেশে মহামতি বুদ্ধের প্রবর্তিত নৈর্বাণিক ধর্ম প্রচারের ও প্রসারের নিরিখে বক্ষে ধারণকৃত অপরিসীম ধর্ম ভাণ্ডার নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর আগমনের বার্তা প্রচারিত হলে বাঙালি বৌদ্ধ সমাজ তাঁর প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে উদগ্রীব। এদিকে তাঁর পরমারাধ্য গুরুদেব আনন্দলোকে অপরিময় প্রীতিরসে বিভোর। গুরুর অন্তরাজ্যের প্রবল আকাঙ্খা ও নিপুন বিশ্বাস যে, ইনি এই শাসন সদ্ধর্মের ভাবী কর্ণধার। তিনিই অধোমুখীকে যেমন উর্ধ্বমূখী, প্রতিচ্ছন্নকে বিবৃত, পথভ্রান্তকে পথ নির্দেশ করা হয় সত্যপথ,ঘন অন্ধকারে ধৃত হয় যেমন দীপ্তোজ্জল আলোকমালা, তেমনি বিবিধ উপায়ে পাণ্ডিত্যের দ্বারা মানবের মুক্তিপদ অতি সত্য চিরভাস্বর ধর্মের ধারক ও বাহক হিসেবে আশার আলোকে আশ্বস্থ হলেন আচারিয় গুরুদেব।

একদিন ক্ষণজন্মা পুণ্যপুরুষ পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্য সত্যধর্মের দীপশিখা হাতে নিয়ে স্বীয় গন্তব্যস্থল মাতৃভুমিতে পৌঁছলেন। তাঁর আগমনের শুভ সংবাদে জ্ঞাতি স্বজন ও অগণিত ভক্তবৃন্দ দর্শন লাভ করার অধীর উদগ্রীব হয়ে পড়েলেন। পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্যের কিরণোজ্জল চন্দ্রসম বিমল ধর্মের জ্যোতিচ্ছটা বিচ্ছুরণ করে মোহগ্রস্থ মানুষের অন্তরের ঘোর মলিন তমসাকে দূরীভুত করছিল। এ মহীয়ান পুণ্যশ্লোকের অসাধারণ, অবর্ণনীয় পাণ্ডিত্য ও গুণকীর্তনের প্রভায় সর্ব্বস্তরের মানুষ প্রভাবিত হলেন। ধর্মের নিগুঢ় তত্ত্ব তিনি সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিতেন। তাঁর অমেয় বাণী ধর্মকথা শ্রবণে অগণিত শ্রোতৃবৃন্দ মনোরমিত ও চমৎকৃত হতেন।

তিনি যখন দ্বিতীয়বার লংকায় গমন করেন তখন তথাকার সুপ্রসিদ্ধ সর্বজন নন্দিত সংঘনায়ক এলুকেটিয়া বিহারের বিহারাধিপতি শ্রীমৎ ধীরানন্দ মহাস্থবিরের নিকট হতে পরম দুর্লভ বুদ্ধের পুতাস্থি এনে স্বগ্রামে (তালসরা আনন্দরাম বিহারে) 'মুৎসুদ্দিপাড়া বিবেকারাম সংলগ্ন বুদ্ধ ধাতু মন্দিরে, বড়িয়া মনোরঞ্জন বিহার সংলগ্ন বুদ্ধ ধাতু মন্দিরে, রাঙ্গুনিয়া থানার বাগোয়ান গ্রামে ও আরো অজ্ঞাত দু'গ্রামে নিধান করে মেঘাচ্ছন্ন বাঙালি বৌদ্ধদের নৈর্বাণিক সাধনার ও ভব-দুঃখ মুক্তির অন্বেষণে অকৃত্রিম অনবদ্য অবদান রেখেছেন। অদ্যাবধি সেই নিধানকৃত নরদেবপূজ্য পুতাস্থির প্রত্যেক বৎসর স্বগৌরবে মুৎসুদ্দিপাড়ায় মহাসমারোহে ৪ঠা চৈত্র মেলা উৎসব উদ্‌যাপিত হয় এবং সেদিবসে সর্বস্তরের অগণিত ভক্তবৃন্দ কর্তৃক বেদীমুলে পূজা অর্চনার ও পঞ্চশীল গ্রহণের মাধ্যেমে উপসনাদির আয়োজন করা হয়। তৎপর দিনব্যাপী মহাকারুনিক বুদ্ধের অমৃতময় নৈসর্গিক বাণী পণ্ডিত প্রাজ্ঞ ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক দেশনা করা হয়। এভাবে তিনি পর পর তিনবার লংকা গমন করে বৌদ্ধ ধর্মদর্শনে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করে স্বজাতি বাঙালি বৌদ্ধদের মধ্যে প্রাচার করে ধন্য করেছেন। বলা বাহুল্য কালের করাল গ্রাসে এদেশের বৌদ্ধরা একসময় ধর্মীয় শিক্ষা সংস্কৃতি ও নীতি আদর্শ সব কিছু হারিয়ে মিথ্যাদৃষ্টির আশ্রয়ে ও কুসংস্কার নীতিতে আচ্ছাদিত হয়েছিল।

প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থাবিরসহ আরো করেকজন সাংঘিক ব্যক্তিত্ব শ্রীলংকা ও বার্মা গমন করে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে লেখাপড়া করে চট্টগ্রামে প্রত্যাবর্তন করে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন বৌদ্ধ সমাজকে সংস্কার সাধন করেছিলেন। তাঁদের এ অবদান নিঃসন্দেহে অবিস্মরণীয়।

ব্রহ্মদেশে গমন

পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের জ্ঞান অন্বেষণের স্পৃহা অদম্য। তিনি আরো জানতে চান, আরো শিখতে চান। তাঁর জ্ঞান-অন্বেষার যেন শেষ নেই। তিনি সুদূর বার্মায় গিয়ে সদ্ধর্ম শিক্ষা গ্রহণে মনস্থির করলেন। এক শুভদিনে যাত্রা করলেন প্রতিরূপদেশ নামে খ্যাত বার্মার (মায়ানমার) উদ্দেশ্যে। যথাসময়ে বার্মায় উপনীত হয়ে রেঙ্গুনের বিভিন্ন বিহার দর্শন করে অভিভূত

হয়ে পড়েন। এরূপ স্বর্গের বিমান-সদৃশ বিহার সমূহ দেখে তাঁর অন্তর শ্রদ্ধায় নমিত হলো। বার্মার জনগণের ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা, সদ্ধর্মের প্রতি গৌরব, সদ্ধর্ম রক্ষা ও প্রচার-প্রসারে তাঁদের যে আত্মত্যাগ তা দেখে তিনি বিস্ময়াভিভূত হলেন। তাঁদের এ কি অদ্ভুদ দানচেতনা।

রেঙ্গুন ছাড়াও পার্শ্ববর্তী অপরাপর স্থানের তীর্থ এবং নামকরা বিহার সমূহ তিনি ঘুরে ঘুরে দর্শন করলেন। যতই দেখেন ততই তাঁর অন্তর শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে উঠে। তিনি মনে করলেন যে, প্রতিরূপ দেশ বার্মার এহেন অপূর্ব দৃষ্টিনন্দন বিহারসমূহ দেখে তাঁর জীবন সার্থক হয়েছে। তাঁর জন্ম সার্থক, বার্মা আগমন সার্থক। মাঝেমধ্যে মনে হয়, কেন এরূপ প্রতিরূপ দেশে জন্মগ্রহণ করেন নি।

অতঃপর প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির রেঙ্গুনে বিদর্শন ধ্যান করার জন্য বিখ্যাত বিদর্শন গুরুর সান্নিধ্যে গিয়ে কর্মস্থান গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘ কয়েক মাস বিদর্শন সাধনায় রমিত হন। ঐকান্তিক চেষ্টা ও একাগ্রতাগুণে মহাস্থবির প্রজ্ঞাতিষ্য অচিরে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হলেন। বিদর্শন সাধনায় তিনি লাভ করলেন সাফল্য। তাঁর এই সাফল্যের বহু কাহিনী, বহু দৃষ্টান্ত তাঁর আবাসস্থানের জনসাধারণ এখনো শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে; লোকমুখে এখনো কিংবদন্তী আকারে শোনা যায় তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের চরমোন্নতির বিষয়। শ্রদ্ধায় নমিত হয় এখনো হাজার হাজার ভক্তপ্রাণ মানুষের হৃদয়। জ্ঞান আহরণে তিনি ক্ষান্ত হননি। সাধারণ মানুষ যদিও তাঁকে একজন ক্ষণকালের মহাজ্ঞানজগতের ভাণ্ডাগারিক হিসেবে আধ্যায়িত করেন, তথাপি তিনি নিজেকে কখনো বড় মনে করতেন না। তিনি কখনো কখনো স্থির দৃষ্টিতে নিঃফলক নয়নে একচিত্তে আধ্যত্মিক সাধনায় নিমগ্নে থাকতেন। ধীমান পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্য জ্ঞান সাধনার আলোকে ভাবতেন যে, এ লোকভূমি নিতান্তই অধ্রুব, দুঃখের আকর।

ব্রহ্মদেশে বিহার প্রতিষ্ঠা

মহীয়ান পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির মহোদয় বাঙালি বৌদ্ধদের ভবিষ্যৎ রূপরেখার চিন্তাধারায় আপ্লুত হয়ে বৌদ্ধ প্রতিরূপ দেশ ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনে বিহার বা প্যাগোডা প্রতিষ্ঠা করে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন।

উপনিবেশিক শাসন আমলে নিরবিচ্ছিন্ন লীলাস্থল বঙ্গভূমির বাঙালি

বৌদ্ধ অধিবাসীরা বিশেষ করে ব্যবসা বাণিজ্যর জন্য রেঙ্গুনে বা ব্রহ্মদেশে যেতেন এবং বিভিন্নস্থানে জীবিকা নির্বাহার্থে কর্মসংস্থান খুঁজতেন। কেউ কেউ তথায় বসবাস করে সেখানেই সংসার ধর্ম পালন করতেন। কিন্তু হায় কি নিদারুন ও শংকিত মর্মদাহী হতাশায় তাদের জীবন যাত্রার মান। তাদের ধর্মীয় কার্যাদি পরিচালনা করা এবং বাঙালি বৌদ্ধ ভিক্ষু শ্রমণদের অবস্থান করার মত কোনো স্থায়ী বিহার ছিল না। রেঙ্গুনস্থ বিশিষ্ট কয়েকজন বাঙালি বৌদ্ধ দায়ক-দায়িকা ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সর্বাত্মক সহযোগিতায় এবং কর্মযোগী পরম পুরুষ শ্রীমৎ প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রেঙ্গুনের প্রকৃতির লীলা নিকেতন, বিলাস বহুল ও মনোরম রাজশ্রী মণ্ডিত পরিবেশে ১৯০২ সালে রেঙ্গুন বঙ্গীয় ধর্মদূত (রেঙ্গুনে জাতীয়) বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর এ অনবদ্য অবদানের জন্য তিনি বাঙালির মানসপটে চির ভাস্কর হয়ে আছেন। তাঁর স্বহস্তের অনেক অনেক ভাস্কর্য ও কীর্তি কাহিনীর স্মৃতি এবং তাঁর অপরিমেয় ত্যাগ তিতিক্ষার মনোরম কাহিনী এখনো লোকমুখে শোনা যায়। সংঘ শক্তি পত্রিকার বিবরণ মতে, 'এই বিহার ও বিহারস্থ ভিক্ষুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ-পোষণ ইত্যাদি সুপরিচালনার এবং নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি এবং জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন উৎসবাদি পালনের জন্য একই বছর 'চট্টল বৌদ্ধ সমিতি' বা 'দি চিটাগাং বুড্ডিষ্ট এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করা হয়। ধর্মদূত বিহারের অধ্যক্ষ প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির (১৮৭১-১৯৩২) এ সমিতির স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি রেঙ্গুনে বেশ কয়েক বছর অতিবাহিত করে বড়ুয়া বৌদ্ধদের সহিত গভীর হৃদ্যতা গড়ে তোলেন, রেঙ্গুন ধর্মদূত বিহারে ছয়-সাত বৎসর পর্যন্ত বিহারাধ্যক্ষ পদে ও বিহার পরিচালনা কমিটির সভাপতির পদে সমলংকৃত ছিলেন। কঠোর পরিশ্রমী কর্মযোগী পণ্ডিত শ্রীমৎ প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির আত্মসাধনার পাশাপাশি পরহিতার্থে দ্বারে দ্বারে চাঁদা সংগ্রহ করে রেঙ্গুনে ধর্মদূত বিহারের পূর্ণাঙ্গ রূপদান করেন। তারই ফলশ্রুতিতে রেঙ্গুনে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাসরত বহু প্রবাসী বাঙালি বৌদ্ধ একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এবং ধর্মীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ লাভ করেছেন। স্বজাতি ও শাসনের শ্রীবৃদ্ধির জন্য তিনি বহু বাঙালি কুলজাত সন্তানকে প্রব্রজ্যা ধর্মে

দীক্ষা দান করেন। বিচ্ছিন্নভাবে বসবাসরত বার্মায় বাঙালি বৌদ্ধরা ধর্ম চর্চা, শিক্ষা সংস্কৃতিতে আন্তরিকতার সহিত মনোনিবেশ করার পরিবেশ লাভ করলেন। মহাসাধকের অনুপ্রেরণায় প্রবাসী বাঙালি বৌদ্ধরা যেন চলার গতিধারা লাভ করতে সক্ষম হলেন। দীর্ঘ ছয় সাত বছর অবস্থান কালে পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির এখানে বৌদ্ধ ধর্মদর্শন ও বিনয় শিক্ষা গ্রহণ করে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি বার্মিজ ভাষায়ও ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। অতঃপর তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। সঙ্গে নিয়ে আসেন বার্মা লিপিতে পালি পিটক সাহিত্য। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির রেঙ্গুনে ধর্মদূত বিহারের অধ্যক্ষের দায়িত্ব প্রদান করেন তাঁর অন্যতম প্রিয় শিষ্য শ্রীমৎ সোমানন্দ ভিক্ষুর উপর।

ভারতের তীর্থস্থান দর্শনে

ত্রিপিটক শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয় যে, বর্তমান ভারতকে বুদ্ধের সমসাময়িককালে জম্বুদ্বীপ বলা হতো। জম্বুদ্বীপের বুকে সুশোভিত অলকাপুরী সদৃশ মনোরঞ্জনকর সে দ্বীপ। সে দ্বীপবাসীও একদিন বুদ্ধের অমৃতময় পীযুষধারায় প্লাবিত করেছে নিজেদের জীবনকে। মহামতি বুদ্ধের সুপটিপন্ন অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র মহান সংঘ সেখানেই সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাঁরাই দেশ-দেশান্তরে বুদ্ধের লব্ধ সত্যধর্মের অভয়বাণী প্রচার ও প্রসারে অনবদ্য অবদান রেখেছিলেন। কিন্তু কালের বিবর্তনে একসময় ভারতবর্ষ হতে প্রকৃত বৌদ্ধরা বিতারিত হয়। উনবিংশ শতকে বৃটিশ শাসনামলে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের পুনঃরুত্থান শুরু হয়। ভারতের দেশ জুড়ে রয়েছে মহামতি বুদ্ধের অক্ষয় স্মৃতি মণ্ডিত তীর্থস্থান। যে স্থান দর্শনে অবিদ্যাচ্ছাদিত মানুষের অন্তরাজ্যে জ্ঞানচক্ষু উৎপন্ন হয়। খুঁজে পায় ভবিষ্যতের গতিধারা। কায়-মন-প্রাণে গ্রহণ করে দুঃখ মুক্তির সত্য ধর্ম। অনুশীলন করেন ধ্যান সাধনা। পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির মহামানব তথাগত বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত ভারতবর্ষের বিভিন্ন বৌদ্ধ তীর্থস্থান যথাক্রমে বুদ্ধগয়া, সারনাথ, রাজগীর, কুশীনগর, লুম্বিনী, কপিলাবস্তু, নালন্দা প্রভৃতি এবং অপরাপর ঐতিহাসিক

স্থানসমূহ দর্শন করার জন্য গমন করেন। পুণ্যতীর্থ দর্শনে অভিভূত হন এবং কয়েকমাস সেখানে অবস্থান করেন। অতঃপর মহান সাধক পণ্ডিত শ্রীমৎ প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির মনোরম সুরম্যভুমি রাজগৃহে এক বর্ষা অতিবাহিত করেন। তীর্থ দর্শন শেষে তিনি স্বদেশে নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন তাঁর শারীরিক অবস্থা ভালো যাচ্ছিল না। তিনি ধীরে ধীরে বার্ধ্যক্যে আক্রান্ত হয়ে পড়ছিলেন। তাই মনস্থির করলেন শেষ জীবনটুকু প্রিয় জন্মভূমিতে কাটাবেন এবং বড়ুয়া জনসাধারণের ধর্মীয় উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করবেন। তিনি স্বদেশে তাঁর জন্মজনপদ তালসরা গ্রামে কিছুকাল অবস্থান করার পর শেষ জীবন মুৎসুদ্দীপাড়ায় অতিবাহিত করেন।

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ধ্যান সাধনায়

পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির একান্তভাবে উপলদ্ধি করলেন যে, বিদর্শন সাধনা ব্যতীত দুঃখ-মুক্তি অসম্ভব। জীব-জগতের সংসার চক্রের আবর্তনে সকলে প্রতিনিয়ত ঘুর্ণয়মান; এর একমাত্র কারণ তৃষ্ণা। তৃষ্ণা বা তীব্র আসক্তির কারণে প্রাণিগণ নতুন নতুন কর্ম সৃষ্টি করে, ফলে নতুনভাবে জন্ম গ্রহণে বাধ্য হয়। এই তৃষ্ণায় আকৃষ্ট বা আবর্তিত হবার প্রধান কারণ অবিদ্যা। অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার কারণে মানুষ সত্যাসত্য সারাসার উপলদ্ধি করতে পারে না। শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে,

"অসারে সারমতিনো, সারে চ অসার দস্‌সসিনো
তে সারং নাধিগচ্ছন্তি, মিচ্ছাসংকপ্‌পো গোচরা।
সারঞ্চ সারতো ঞত্বা, অসারঞ্চ অসারতো,
তে সারং অধিগচ্ছন্তি, সম্মাসংকপ্‌পো গোচরা"

যারা অসারকে সার এবং সারবস্তুকে অসার মনে করে, সেই মিথ্যাসংকল্পকারীরা কখনো সারবস্তুর সন্ধান পায় না। যাঁরা সার বস্তুকে সার এবং অসারবস্তুকে অসাররূপে জানেন, সেই সম্যক সংকল্পকারী ব্যক্তিরা প্রকৃত সার বস্তু লাভে সমর্থ হন।

প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির সত্য মিথ্যাকে যথার্থরূপে জানার জন্যই তো

প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাই প্রতিনিয়ত সত্যবিষয় অধিগত করার আকাঙক্ষা তাঁকে যেন তাড়িত করত। যখনই সুযোগ এসেছে তখনই তিনি সত্য বিষয়ের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করতে কুণ্ঠিত হতেন না। একাগ্র মনে সত্য সাধনায় রমিত হতেন। পুণ্যতীর্থ রাজগীর হতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি বিদর্শন সাধনায় আত্মনিয়োগে মনস্থির করলেন। বোয়ালখালী থানার বৈদ্যপাড়া গ্রামের অনতিদূরে রয়েছে প্রকৃতির অনিন্দ্য লীলাভূমি অনুচ্চ পাহাড়, সেই পাহাড়ে প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির নির্মাণ করলেন পর্ণ কুটির; আর সেই কুটিরে বিদর্শন ধ্যানে রমিত হলেন তিনি। দিনের বেলায় অদূরে গ্রামে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতেন, আর সারাক্ষণ অরণ্যে পর্ণ কুটিরে ধ্যানমগ্ন থাকতেন। এখানে বেশ কিছুকাল অতিবাহিত করার পর তিনি চলে গেলেন সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত সুইপুরা গ্রামের নিকটবর্তী অরণ্যে। এখানে ভক্তগণ তাঁর জন্য নির্মাণ করে দিলেন পর্ণ কুটির। নির্জন বনাঞ্চলে তিনি একাগ্রচিত্তে বিদর্শন সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন। এখানে প্রায় বছর কাল সময় তিনি ধ্যান সাধনায় রমিত ছিলেন। এ সময়ে হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান সকল সম্প্রাদায়ের মানুষ তাঁর ধ্যান চর্চা দেখে অভিভূত হয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য তাঁর আশ্রামে যেতেন। তিনি তথাগত বুদ্ধের অমৃতময় উপদেশ বাণী অতি সহজ সরল ভাষায় দর্শনার্থীদের কাছে দেশনা করতেন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে তাঁর ধর্মোপদেশ শোনে অতীব সন্তোষ প্রকাশ করত। কিংবদন্তী আছে, এখানে পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির যখন আসেন তখন একদিকে ছিল বুনো হিংস্র প্রাণিদের উপদ্রব অন্যদিকে ছিল অপদেবতাদের উৎপাত। আশ্চর্যের বিষয় অহিংসা প্রেম মৈত্রীর পূর্ণ প্রতীক মহান সাধক প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের সাধন-তেজে সকল প্রকার বন্য অমনুষ্য উপদ্রব তিরোহিত হয়েছিল। মহাস্থবিরের শীল গুণে বিমুগ্ধ হয়ে কোনো কোনো বুনো হিংস্র প্রাণি তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে সাধন কুঞ্জের চারদিকে অবাধে ঘোরাফিরা করত; এরূপ অত্যাশ্চর্য অবস্থা দেখে স্থানীয় জনসাধরণ বিস্ময়াবিষ্ট হত।

এখানে অবস্থান কালে তাঁর নিকট সকল ধর্মের জ্ঞান পিপাসু মানুষ সমবেত হয়ে তথাগত বুদ্ধের অমৃতময় ধর্মবাণী শ্রবণ করে পরম তৃপ্তি পেতেন।

বিভিন্ন ধর্ম দর্শনের জটিল বিষয়গুলো অতি সহজ ও সরল ভাষায় তিনি সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে উপস্থাপনে পারদর্শী ছিলেন। সুইপুরা বনাশ্রমে তিনি বেশ কিছুকাল ধ্যান সাধনায় অভিরমিত ছিলেন।

সুইপুরা বনাশ্রম থেকে মহাস্থবির প্রজ্ঞাতিষ্য চলে আসেন পটিয়া থানার অন্তর্গত কর্ণফূলী নদী বিধৌত শাহমীরপুর (জুলদা) গ্রামের অদূরে বনাঞ্চলে। এখানেও তিনি কিছুদিন নির্জন ধ্যানে অতিবাহিত করেছিলেন। কিন্তু বেশিদিন নির্জন বনাঞ্চলে নিভৃত জীবনচর্যা আর সম্ভব হলো না। তিনি তখন বার্ধ্যক্যে উপনীত, জরায় আক্রান্ত। শরীর যখন দুর্বল হয় মনও তখন দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলে। এ সময়ে তাঁর সেবা প্রয়োজন, সাহচর্য প্রয়োজন। অনন্তর সাধক প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির স্বীয় জন্মজনপদ তালসরা গ্রামের বিহারে কিছু কাল অবস্থান করেন।

এখান থেকেও পরবর্তীতে চন্দনাইশ থানার মধ্যম জোয়ারা গ্রামেও বছরখানেক অবস্থান করে সাধারণের মধ্যে তিনি ধর্মসুধা বিতরণ করেন এবং গ্রামের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অবদান রাখেন। এরপর পুনরায় স্বগ্রাম তালসরায় কিছুকাল অবস্থান করে গ্রামের ধর্মীয় উন্নয়নে অসীম অবদান রাখেন। অতঃপর জীবনের অন্তিম সময় তিনি মুচ্ছদ্দীপাড়ায় অতিবাহিত করেন।

সদ্ধর্ম প্রচারে

প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির প্রতিষ্ঠানিক আধুনিক শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত এবং বৌদ্ধধর্ম দর্শনে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তিনি শ্রীলংকায় বিখ্যাত ত্রিপিটকাচার্য উপসেন মহাস্থবির ও সুমঙ্গল মহাস্থবিরের নিকট বৌদ্ধ ধর্মদর্শন ও বিনয় অধ্যয়ন করে প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন। পরবর্তীতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি তাঁর অধীত জ্ঞান চট্টগ্রামের পশ্চাদপদ বৌদ্ধ জনসাধারণের মধ্যে দেশনা করতেন। তাঁর সহজ সরল ভাষায় ব্যাখ্যাত ধর্মবাণী সাধারণ মানুষের মর্ম স্পর্শ করত। তাঁর প্রাঞ্জল ভাষায় দেশিত বুদ্ধের অমৃতময় বাণী শুনে জাতিধর্ম

নির্বিশেষে বিমোহিত হতেন। তিনি যে সভায় উপস্থিত থাকতেন সেখানে শত শত ধর্ম পিপাসু নর-নারী তাঁর মুখ নিঃসৃত দেশনা শোনার জন্য ছুটে যেতেন। বৌদ্ধ দর্শনের জটিল বিষয়গুলোকেও তিনি অতি সহজ ভাষায় দৃষ্টান্ত উপমা সহকারে এমনভাবে পরিবেশন করতেন যে, একজন সাধারণ শ্রোতাও বিমোহিত হতো । তিনি চট্টগ্রামের বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রামে ধর্মীয় সভায় বুদ্ধের ধর্ম দর্শন দেশনার সাথে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কার অপনোদনের জন্য যুক্তিসঙ্গত উপদেশ দেওয়া সহ সদ্ধর্ম অনুশীলন ও বৌদ্ধিক জীবন যাত্রার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতেন। তাঁর এসব উপদেশ সমাজদেহ হতে কুসংস্কার অপনোদনে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। বস্তুতপক্ষে প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির ছিলেন অসীম ধী শক্তির অধিকারী। তিনি অধ্যাবসায়বলে বৌদ্ধধর্ম দর্শনসহ অপরাপর বিষয়ে প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর অধীত জ্ঞান সাধারণ শ্রোতাদের মধ্যে বিতরণের কর্মকুশলতা, বাগপটুতা, গাম্ভীর্যতা, সর্বোপরি মননশীলতার যে অপূর্ব পরিচয় লক্ষ্য করা যেত সমসাময়িক কালে সেরূপ আর দেখা যায়নি। তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্যে বিমোহিত বিদগ্ধজন তাঁকে পণ্ডিত অভিধায় বিভূষিত করেন। তিনি সর্বত্র পণ্ডিত ভান্তে নামে পরিচিতি লাভ করেন।

পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির অনগ্রসর বড়ুয়া বৌদ্ধ সমাজে সদ্ধর্ম দেশনার সাথে সাথে শিক্ষা সংস্কৃতি চর্চায়ও সাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি চন্দনাইশ থানার অন্তর্গত জোয়ারা সুখানন্দ বিহারে অবস্থান করার সময় স্থানীয় বৌদ্ধ ছেলে মেয়েদের ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করার মানসে প্রতিষ্ঠা করেন পালি কলেজ। একলেজ থেকে বহু ভিক্ষু শ্রামণসহ ছেলে মেয়ে ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়নের সুযোগলাভ করেন। মুচ্ছাদ্দী পাড়া গ্রামে অবস্থানকালে তিনি সেগ্রামের ছেলে মেয়েদের প্রাত্যহিক ধর্ম শিক্ষার প্রবর্তন করেন। প্রত্যেকে সকাল বিকাল উপাসনায় অংশ গ্রহণ করতেন। তিনি এখানে দীর্ঘ প্রায় বার বছর অবস্থান কালে এ গ্রামসহ পার্শ্ববর্তী গ্রামের ধর্মীয় শিক্ষা প্রসারে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেন। মহাকরুণাঘন তথাগত বুদ্ধ প্রথম বর্ষাবাস অবসানে ষাটজন অর্হৎ ভিক্ষুকে উপলক্ষ করে নির্দেশ

দিয়েছিলেন 'চরথ ভিক্খবে চারিকং বহুজন হিতায, বহুজন সুখায অত্তায হিতায সুখায দেব মনুস্সানং। দেসথ ভিক্খবে ধম্মং আদি কল্যাণং মজ্ঝে কল্যাণং পরিযোসনং কল্যাণং সাত্থং সব্যঞ্জনং কেবল পরিপুন্নং পরিসুদ্ধং ব্রহ্মচরিযং, পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির বুদ্ধের সেই নিদের্শবাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালনে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি আত্মহিতে যেমন প্রাতিমোক্ষ শীল পুঙখানুপুঙখভাবে প্রতিপালনে যত্নবান ছিলেন তেমনি পরহিতেও সদ্ধর্ম প্রচারে ঐকান্তিক ছিলেন। এরূপ আত্মহিত ও পরিহিত ব্রতী মহান ভিক্ষু অতি বিরল।

'পণ্ডিত' ও 'শাসনধ্বজ' অভিধা লাভ

দুল্লভো পুরিসাজঞ্ঞো ন সো সব্বত্থ জাযতি,
যত্থ সো জাযতি ধীরো তং কুলং সুখমেধতি। ধম্মপদ ঃ ১৯৩

উত্তম পুরুষের জন্ম অতি দুর্ভল; তিনি যেখানে সেখানে জন্ম গ্রহণ করেন না। যেখানে সেই মহান ব্যক্তির জন্ম হয়, সেই দেশ ও জাতি সুখ-সমৃদ্ধ হয়। বাঙালি বৌদ্ধদের অতীত ইতিহাস অনেকটা তমসাবৃত। বিশেষ করে বাংলাদেশে পাল রাজ্যের অবসানের পর বাঙালি বৌদ্ধরা একটি দীর্ঘ সময় অতি ঘন তিমিরাচ্ছন্ন সংকটময় কাল অতিবাহিত করেছে। তাদের অতীত আচার-অনুষ্ঠান, ধর্ম-সংস্কৃতি, কৃষ্টি-ঐতিহ্য ইত্যাদি অনেক কিছুই তারা অনেকটা বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। সমাজ ও ধর্মে প্রবেশ করেছিল বহু কুসংস্কার। উনবিংশ শতকের রেঁনেসার যুগে বাঙালি বৌদ্ধদের নব জাগরণে যে কতিপয় বাঙালি বৌদ্ধ মনীষী অনবদ্য অবদান রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্য ছিলেন অন্যতম, তিনি উনবিংশ শতকের শেষান্তে আবির্ভূত হয়ে বিংশ শতকের প্রথমার্ধের তিনদশক পর্যন্ত বাঙালি বৌদ্ধদের নব জাগরণে প্রভূত অবদান রেখেছিলেন এটা বলাই বাহুল্য; এজন্য তিনি বাঙালি বৌদ্ধদের মধ্যে একজন অন্যতম ক্ষনজন্মা কৃতি সাঙ্ঘিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর আবির্ভাবে বাঙালি বৌদ্ধ সম্প্রদায় নিঃসন্দেহে উপকৃত হয়েছে। তাই তাঁর জন্ম জনপদ সার্থক, বাঙালি বৌদ্ধ সম্প্রদায় সার্থক।

প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির দীর্ঘ চার যুগ ধরে শাসন সদ্ধর্মের কল্যাণে নিরলসভাবে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আবালবৃদ্ধ বণিতা থেকে শুরু করে তৎকালীন সমগ্র ভিক্ষুসংঘ তাঁর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুসংঘ তাঁকে অকৃত্রিম ভালোবাসতেন আর কনিষ্ঠ ভিক্ষুসংঘরা ছিলেন তাঁর প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধাসম্পন্ন; আর সাধারণ জনগণ তো প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির বা পণ্ডিত ভান্তে বলতে শ্রদ্ধায় নমিত হয়ে পড়তেন। বুদ্ধের শাসনের প্রতি তাঁর অবিচল শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, সদ্ধর্ম চর্চায় তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা, বুদ্ধের শাসন রক্ষায় ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তাঁর বিরামহীন প্রয়াস দেখে অভিভূত হয়ে তৎকালীন আর এক বৌদ্ধ ভিক্ষুকুল গৌরব সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার দ্বিতীয় সংঘরাজ ধর্মধারী আচার্য পূর্ণাচার মহাস্থবিরের (চন্দ্রমোহন মহাস্থবির) সভাপতিত্বে ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে (১৩১০ বঃ) ভিক্ষু মহাসভার অধিবেশনে তাঁকে 'শাসনধ্বজ' অভিধায় অভিষিক্ত করা হয়। যোগ্য ব্যক্তির যথার্থ মূল্যায়ন সেদিনের বাঙালি বৌদ্ধদের সমাজ সদ্ধর্মের বিকাশে যথার্থ বলে বিবেচনার দাবী রাখে।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বেশিদুর না হলেও তিনি ছিলেন ধর্ম বিনয়ে সুশিক্ষিত। সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই স্বশিক্ষিত। তিনি শ্রীলংকা ও বার্মায় যে বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শনের উপর শিক্ষা লাভ করেছিলেন তাতে করে তিনি যে অনবদ্য জ্ঞান অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন তা সমসাময়িক কালে বিরল। তিনি সেই শিক্ষাকে ব্যক্তিগত জীবনে এবং পিছিয়ে পড়া বৌদ্ধ সমাজের অগ্রগতি সাধনে সর্বাত্মক প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি অনর্গল বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনের উপর অখাট্য যুক্তি উপস্থাপন করে ধর্ম দেশনা করতে অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁর দেশনা যেমন ছিল শ্রুতিমধুর তেমনি ছিল সর্বজনবোধ্য। তাঁর বাচন ভঙ্গি, উপস্থাপনের কৌশল, উপস্থাপিত বিষয়ের যৌক্তিকতা, সর্বোপরি সুললিত কণ্ঠের অমৃতবৎ ধ্বনি সর্বসাধারণকে বিমোহিত করত। এরই নিরিখে তিনি একবাক্যে সকলের কাছে 'পণ্ডিত ভান্তে' নামে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি 'পণ্ডিত' অভিধা লাভ করেন সর্ব সাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের মাধ্যমে। এমন অভিধা কয়জেনর ভাগ্যে হয়? তাঁর কর্ম তাঁর অসম প্রতিভা তাঁকে

অতি সম্মানজনক 'পণ্ডিত' অভিধায় বিভূষিত করেছিল। তাঁর পণ্ডিত্যের জন্য তিনি এখনো এতদঞ্চলে 'পণ্ডিত ভান্তে' নামে পরিচিত হয়ে আছেন।

মুচ্ছদ্দীপাড়ায় অন্তিম জীবন

মুচ্ছাদ্দীপাড়া আনোয়ারা থানার অন্তর্গত বৌদ্ধ গ্রামগুলোর মধ্যে একটি ছোট অথচ অতি পরিচিত গ্রাম। এ গ্রামের পরিচিতির পেছনে প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থাবিরের শেষ বারটি বছর সগৌরব অবস্থান। গ্রাম বাংলার নৈসর্গিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত এ ক্ষুদ্র গ্রামে নির্জন সাধু সন্ন্যাসীর বাসোপযোগী বিবেকারাম বিহার ধ্যান সাধনার অনুপম অনুকুল পরিবেশে অবস্থিত। এ বিহারের নাম তালসরা মুচ্ছদ্দীপাড়া বিবেকারাম বিহার। এ বিহারে পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির জীবনের শেষ এবং শ্রেষ্ঠতম বারটি বছর অতিবাহিত করেছেন ধ্যান সাধনা আর জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে। দীর্ঘএকযুগ পুণ্য পুরুষ প্রজ্ঞাতিষ্য মুচ্ছদ্দীপাড়া বিবেকারাম বিহারে সগৌরবে অবস্থান কালে নিকটবর্তী তালসরা, চেনামতি, ওসখাইন, বাথুয়া, বড়িয়া, তিশরী, রুদুরাসহ পটিয়া, চন্দনাইশ থানার বিভিন্ন বৌদ্ধগ্রামে বিচরণ করে এদঞ্চলের বৌদ্ধদের সামজিক ও ধর্মীয় উন্নতি বিধানে অসমান্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রায় সময় বিবেকারাম বিহার ধর্ম পিপাসু নর-নারী ভক্তবৃন্দের আগমনে মুখরিত থাকত। তাঁর মুখে তথাগত বুদ্ধের অমৃতবাণী ধর্মসুধা শোনে কৃতার্থ হতেন। বুদ্ধের অনিত্য দুঃখ অনাত্মময় ধর্মবাণী শ্রোতৃবৃন্দের অতৃপ্ত ধর্মতৃষ্ণা মেঠাত। তিনি বৌদ্ধ পণ্ডিত ভদন্ত নাগসেনের মত ধর্মদর্শনের জটিল বিষয়কে অতি সহজ ও সরল ভাষায় উপমা সহকারে সাধারণের আকর্ষণীয় করে দেশনা করতে পারতেন। তাই যে কোনো জটিল বিষয়ে জানার জন্য তৎকালীন ধর্ম লিপ্সুরা তাঁর শরণাগত হতেন।

বুদ্ধের শাসনের শ্রীবৃদ্ধি করে সদ্ধর্মকে দীর্ঘস্থায়ী করতে পারে নিবেদিত প্রাণ ধর্ম-বিনয়ে পারগৃ ভিক্ষুসংঘরা। ভিক্ষুসংঘ সমাজের মস্তিস্ক সদৃশ আর দায়ক সংঘ দেহ সদৃশ। যার মস্তিস্ক যত বেশি তীক্ষ্ণ ও উর্বর তিনি যেমন স্বীয় বুদ্ধি বলে উন্নতির শিখরে আরোহন করতে পারেন, তেমনি ভিক্ষুসংঘ যত বেশি শীলবান ও প্রজ্ঞাবান হবেন সমাজও তত বেশি সুসংস্কৃত ও উন্নতশীল হবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। বাঙালি বৌদ্ধদের নব অগ্রযাত্রায়

প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের সঙ্গে ধ্যানী, শীলবান ও প্রজ্ঞাবান পণ্ডিতদের অবদান আজ অকপটে স্বীকার করতে হয়।

পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্য জীবনের শেষ দীর্ঘ বারটি বছর মুচ্ছদ্দীপাড়া বিবেকারাম বিহারে অবস্থান করে সদ্ধর্ম-সংস্কৃতি চর্চার সাথে মুচ্ছদ্দী পাড়াসহ পাশ্ববর্তী গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করতে এখানে তিনি নিয়মিত উপাসনা ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রচলন করেছিলেন। এর ফলে কোমলমতি বালক বালিকাদের নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল।

প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের শিষ্যমণ্ডলী

পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্য ছিলেন একজন বহুমুখী প্রতিভাধর সাংঘিক ব্যক্তিত্ব। তিনি পালি শাস্ত্র অধ্যয়নের সাথে সাথে ইংরেজী, হিন্দি, সংস্কৃত, সিংহলী, বার্মিজ প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। তাঁর অধ্যবসায় স্পৃহা ছিল অসাধারণ; তাই স্বচেষ্টায় তিনি উপরোক্ত বিভিন্ন ভাষায় যেমন পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন তেমনি বিভিন্ন ধর্ম-দর্শন সম্পর্কেও তাঁর প্রভূত জ্ঞান ছিল। অধ্যয়ন ছিল তাঁর চিরকালের অভ্যাস। বৌদ্ধ শাস্ত্র ব্যতীত তিনি অপরাপর ধর্ম-দর্শনে পারদর্শী ছিলেন বিধায় ধর্ম-দর্শনের নিগূঢ় তথ্য ব্যাখ্যা করতে তাঁর পক্ষে সহজতর হতো।

তাঁর শীলগুণ ও প্রজ্ঞাগুণে আকৃষ্ট হয়ে অনেকে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। চন্দনাইশ থানার অন্তর্গত মধ্যম জোয়ারা বিহারে তিনি যে পালি টোল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেখানে অনেক ছাত্র-ছাত্রী পালি শাস্ত্রসহ বৌদ্ধ দর্শনে শিক্ষা লাভ করে নিজেদের জীবনকে ধন্য করেছেন। বহু ভিক্ষু শ্রামণও এ শিক্ষা নিকতনে তাঁর নিকট শিক্ষা লাভ করেছেন, যারা পরবর্তী জীবনে সমাজ-সদ্ধর্মের উন্নয়নে নিজেদের সম্পৃক্ত করে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি তাঁর শিষ্য এবং ছাত্র-ছাত্রীদের পুত্রবৎ জ্ঞান করতেন। প্রতিটি শিক্ষনীয় বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ পাঠদান প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বিমোহিত করত। তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে পরবর্তী জীবনে

প্রতিষ্ঠালাভ করে গুরুর আদর্শকে সমুন্নত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে বর্তমানে আর কেউ জীবিত নেই। তবে অনেক প্রশিষ্য রয়েছেন যারা দেশে বিদেশে অবস্থান করে পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির ও তাঁর স্নেহধন্য শিষ্যদের সুনাম অক্ষুন্ন রেখে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে অবদান রেখে চলেছেন।

তাঁর ভিক্ষু শিষ্যদের মধ্যে যারা সমাজ ও সদ্ধর্মের কল্যাণে নিবেদিত ছিলেন তাঁদের অন্যতম হলেন প্রয়াত গুণতিষ্য মহাস্থবির (অর্জুন ভান্তে), প্রয়াত সোমানন্দ স্থবির, প্রয়াত প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির, প্রয়াত প্রজ্ঞানন্দ স্থবির,প্রয়াত শ্রদ্ধাতিষ্য মহাস্থবির, প্রয়াত উত্তমানন্দ মহাস্থবির, প্রয়াত বিমলতিষ্য মহাস্থবির, প্রয়াত সুভূতিরত্ন মহাস্থবির, প্রয়াত আনন্দস্বামী, প্রয়াত বুদ্ধানন্দ মহাস্থবির, প্রয়াত কান্তিপাল মহাস্থবির প্রমুখ। এছাড়া আরো অনেক শিষ্য গৃহীধর্ম গ্রহণ করে উন্নততর গৃহী জীবন যাপন করেছেন বলে জানা যায়।

পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্যের শিষ্যদের মধ্যে এখন আর কেউ জীবিত না থাকলেও তাঁদেরও প্রত্যেকের শিষ্য-পরম্পরা প্রজ্ঞাতিষ্য চিরকাল বাঙালি বৌদ্ধ জনমানসে চির ভাস্বর হয়ে থাকবেন। প্রজ্ঞাতিষ্যরূপ মহামহীরূপ বৃক্ষ দেশ-কালের সীমা পেরিয়ে অনন্তকালে পরিব্যাপ্তি লাভ করেছে। তাই প্রজ্ঞাতিষ্যের সৃষ্টি অমর-অক্ষয়, যুগে যুগে তিনি বেঁচে থাকবেন বাঙালির স্মৃতিপটে ইতিহাসের পাতায়।

সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড

প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির সাধন-ভজন এবং জ্ঞান চর্চা ছাড়াও সামগ্রিকভাবে বৌদ্ধ সমাজের অস্তিত্বকে টিকে রাখার চিন্তা করতেন। তিনি সুদূর রেঙ্গুনে গিয়ে দেখলেন, বহু বাঙালি বৌদ্ধ চাকুরী কিংবা ব্যবসা কাজে রেঙ্গুনে গিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করছে, তিনি এসকল বৌদ্ধদের ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন-

'সুখা সঙ্ঘস্স সামগ্গি সমগ্গানং তপো সুখো।'

যে কোন অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হলে ঐক্যের প্রয়োজন। ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস ব্যতীত কখনো কোনো জাতি কিংবা কোনো ক্ষুদ্র সম্প্রদায় টিকে থাকতে পারে না। প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির ছিলেন যেমন দূরদর্শী তেমনি সমাজহিতৈষী। তিনি বিংশ শতকের প্রথম পাদে যখন রেঙ্গুনে উপস্থিত হন তখন রেঙ্গুনে বহু বড়ুয়া বৌদ্ধ অবস্থান করতেন। প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির রেঙ্গুন প্রবাসী বাঙালি বৌদ্ধদের ঐক্যবদ্ধ করলেন এবং বড়ুয়া বৌদ্ধদের পূজাপার্বনাদি সম্পাদনার্থে একটি বিহার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করেন। মূলত তাঁরই অনুপ্রেরণায় রেঙ্গুন শহরে সর্বপ্রথম বাঙালি বৌদ্ধদের প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠান ধর্মদূত বিহার ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির এ বিহারের প্রতিষ্ঠাতা বিহারাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। একই বছরে বাঙালি বৌদ্ধদের সমন্বয়ে গঠিত হয় চট্টল বৌদ্ধ সমিতি, বা দি চিটাগাং বুডিষ্ট এসোসিশেন। ধর্মদূত বিহারের অধ্যক্ষ প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির চট্টল বৌদ্ধ সমিতির স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হয়ে তাঁর দিগ্ নির্দেশনায় বাঙালি বৌদ্ধরা এ সমিতির মাধ্যমে যাবতীয় ধর্মীয় কর্মকাণ্ডসহ সমাজ ও সদ্ধর্মের উন্নয়নে বহু কল্যাণমুখী কাজ সম্পাদন করেছিলেন। বস্তুত চট্টল বৌদ্ধ সমিতি গঠন করা হয়েছিল ধর্মদূত বিহার ও বিহারস্থ ভিক্ষুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণ ইত্যাদি সুপরিকল্পনা এবং নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি এবং ধর্মীয় ও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন উৎসবাদি পালনের জন্য। পরবর্তীকালে প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির ধর্মদূত বিহারের অধ্যক্ষের দায়িত্ব তাঁর শিষ্য সোমানন্দ ভিক্ষুর উপর অর্পণ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯২৭-২৮ খ্রিষ্টাব্দে অগ্‌গমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির (১৮৭৯-১৯৭১) রেঙ্গুনে আগমন করলে তিনি ধর্মদূত বিহারের অধ্যক্ষ ও চট্টল বৌদ্ধ সমিতির স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন। পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্যের হাতে গড়া এ প্রতিষ্ঠানদ্বয়কে ভিত্তি করে পরবর্তীকালে তিনি ব্যাপক কর্মকাণ্ড গড়ে তোলেন, যা বাঙালি বৌদ্ধ সমাজের মাঝে অক্ষয় অবদান ছিলেন চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিংশ শতকের প্রথমাংশে বাঙালি বৌদ্ধদের সামগ্রিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না বললেই চলে। তারা শিক্ষা-সংস্কৃতিতে, অর্থে বিত্তে অনেক

প্রতিষ্ঠালাভ করে গুরুর আদর্শকে সমুন্নত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে বর্তমানে আর কেউ জীবিত নেই। তবে অনেক প্রশিষ্য রয়েছেন যারা দেশে বিদেশে অবস্থান করে পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির ও তাঁর স্নেহধন্য শিষ্যদের সুনাম অক্ষুন্ন রেখে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে অবদান রেখে চলেছেন।

তাঁর ভিক্ষু শিষ্যদের মধ্যে যারা সমাজ ও সদ্ধর্মের কল্যাণে নিবেদিত ছিলেন তাঁদের অন্যতম হলেন প্রয়াত গুণতিষ্য মহাস্থবির (অর্জুন ভান্তে), প্রয়াত সোমানন্দ স্থবির, প্রয়াত প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির, প্রয়াত প্রজ্ঞানন্দ স্থবির,প্রয়াত শ্রদ্ধাতিষ্য মহাস্থবির, প্রয়াত উত্তমানন্দ মহাস্থবির, প্রয়াত বিমলতিষ্য মহাস্থবির, প্রয়াত সুভূতিরত্ন মহাস্থবির, প্রয়াত আনন্দস্বামী, প্রয়াত বুদ্ধানন্দ মহাস্থবির, প্রয়াত কান্তিপাল মহাস্থবির প্রমুখ। এছাড়া আরো অনেক শিষ্য গৃহীধর্ম গ্রহণ করে উন্নততর গৃহী জীবন যাপন করেছেন বলে জানা যায়।

পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্যের শিষ্যদের মধ্যে এখন আর কেউ জীবিত না থাকলেও তাঁদেরও প্রত্যেকের শিষ্য-পরম্পরা প্রজ্ঞাতিষ্য চিরকাল বাঙালি বৌদ্ধ জনমানসে চির ভাস্বর হয়ে থাকবেন। প্রজ্ঞাতিষ্যরূপ মহামহীরূপ বৃক্ষ দেশ-কালের সীমা পেরিয়ে অনন্তকালে পরিব্যাপ্তি লাভ করেছে। তাই প্রজ্ঞাতিষ্যের সৃষ্টি অমর-অক্ষয়, যুগে যুগে তিনি বেঁচে থাকবেন বাঙালির স্মৃতিপটে ইতিহাসের পাতায়।

সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড

প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির সাধন-ভজন এবং জ্ঞান চর্চা ছাড়াও সামগ্রিকভাবে বৌদ্ধ সমাজের অস্তিত্বকে টিকে রাখার চিন্তা করতেন। তিনি সুদূর রেঙ্গুনে গিয়ে দেখলেন, বহু বাঙালি বৌদ্ধ চাকুরী কিংবা ব্যবসা কাজে রেঙ্গুনে গিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করছে, তিনি এসকল বৌদ্ধদের ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন-

'সুখা সঙ্ঘস্স সামগ্গি সমগ্গানং তপো সুখো।'

যে কোন অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হলে ঐক্যের প্রয়োজন। ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস ব্যতীত কখনো কোনো জাতি কিংবা কোনো ক্ষুদ্র সম্প্রদায় টিকে থাকতে পারে না। প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির ছিলেন যেমন দূরদর্শী তেমনি সমাজহিতৈষী। তিনি বিংশ শতকের প্রথম পাদে যখন রেঙ্গুনে উপস্থিত হন তখন রেঙ্গুনে বহু বড়ুয়া বৌদ্ধ অবস্থান করতেন। প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির রেঙ্গুন প্রবাসী বাঙালি বৌদ্ধদের ঐক্যবদ্ধ করলেন এবং বড়ুয়া বৌদ্ধদের পূজাপার্বনাদি সম্পাদনার্থে একটি বিহার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করেন। মূলত তাঁরই অনুপ্রেরণায় রেঙ্গুন শহরে সর্বপ্রথম বাঙালি বৌদ্ধদের প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠান ধর্মদূত বিহার ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির এ বিহারের প্রতিষ্ঠাতা বিহারাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। একই বছরে বাঙালি বৌদ্ধদের সমন্বয়ে গঠিত হয় চট্টল বৌদ্ধ সমিতি, বা দি চিটাগাং বুড্ডিষ্ট এসোসিশেন। ধর্মদূত বিহারের অধ্যক্ষ প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির চট্টল বৌদ্ধ সমিতির স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হয়ে তাঁর দিগ্ নির্দেশনায় বাঙালি বৌদ্ধরা এ সমিতির মাধ্যমে যাবতীয় ধর্মীয় কর্মকাণ্ডসহ সমাজ ও সদ্ধর্মের উন্নয়নে বহু কল্যাণমুখী কাজ সম্পাদন করেছিলেন। বস্তুত চট্টল বৌদ্ধ সমিতি গঠন করা হয়েছিল ধর্মদূত বিহার ও বিহারস্থ ভিক্ষুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণ ইত্যাদি সুপরিকল্পনা এবং নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি এবং ধর্মীয় ও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন উৎসবাদি পালনের জন্য। পরবর্তীকালে প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির ধর্মদূত বিহারের অধ্যক্ষের দায়িত্ব তাঁর শিষ্য সোমানন্দ ভিক্ষুর উপর অর্পণ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯২৭-২৮ খ্রিষ্টাব্দে অগ্‌গমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির (১৮৭৯-১৯৭১) রেঙ্গুনে আগমন করলে তিনি ধর্মদূত বিহারের অধ্যক্ষ ও চট্টল বৌদ্ধ সমিতির স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন। পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্যের হাতে গড়া এ প্রতিষ্ঠানদ্বয়কে ভিত্তি করে পরবর্তীকালে তিনি ব্যাপক কর্মকাণ্ড গড়ে তোলেন, যা বাঙালি বৌদ্ধ সমাজের মাঝে অক্ষয় অবদান ছিলেন চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিংশ শতকের প্রথমাংশে বাঙালি বৌদ্ধদের সামগ্রিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না বললেই চলে। তারা শিক্ষা-সংস্কৃতিতে, অর্থে বিত্তে অনেক

পিছিয়ে ছিল। আনোয়ারা ও পটিয়া থানার ছোট বড় সাতটি বৌদ্ধ গ্রাম; এগুলো যথাক্রমে তালসারা মুচ্ছুদ্দীপাড়া, চেনামতি, ওসখাইন, তিশরী, রুদুরা, বাথুয়া ও বড়িয়া। পাশাপাশি অবস্থিত এ সাতটি গ্রামের বৌদ্ধদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সৌভ্রাতৃত্ব ভাব এবং সমাজ ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির প্রতিষ্ঠা করেন সপ্তগ্রাম বৌদ্ধ সমিতি।

মহাপ্রয়ান

'জন্মিলে মরিতে হবে
অমর কে কোথা রবে'?

সৃষ্ট জীবমাত্রই মৃত্যুর অধীন, এটা জাগতিক বিধান। মহামানব বুদ্ধ যে চারটি মহাসত্যের আবিস্কার করে সিংহনাদে ঘোষনা করেছেন তন্মধ্যে প্রথম সত্যই হচ্ছে জন্ম-জরা-বাধি-মরণ দুঃখ। জাত ব্যক্তি মাত্রই জরা-ব্যাধি এবং মরণ দুঃখের আবেষ্টনী অতিক্রম করতে পারে না। এ অমোঘ দুঃখকে অতিক্রম করতে হলে তৃষ্ণা এবং অবিদ্যার মূলেচ্ছেদ অপরিহার্য। যিনি এসবের মূল্যেৎপাটন করতে সমর্থ তিনিই সমস্ত দুঃখ থেকে বিমুক্ত, বৌদ্ধিক পরিভাষায় পরম সুখকর নির্বাণে উপনীত।

দুঃখ মুক্তির উদগাতা পরম পুরুষ বুদ্ধ তথাগত যে মুক্তিমার্গ প্রদর্শন করেছিলেন সেই মার্গ অনুশীলনকারী নিশ্চিত জন্ম মৃত্যুকে রোধ করতে সক্ষম। প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির আজীবন ব্রহ্মচারী; শ্রামণ্যধর্ম অনুশীলনের সাথে সাথে তিনি ধ্যান সাধনায় রমিত ছিলেন। তিনি কোন ধ্যান স্তরে উপনীত হয়েছিলেন আমরা জানি না, কিন্তু তাঁর জীবনের কিছু কিছু আলৌকিক ঘটনা এখনো এতদঞ্চলের জনসাধারণের মুখে শোনা যায়, যাতে মনে হয় তিনি নিশ্চিতরূপে উন্নততর ধ্যান পর্যায়ে উপনীত হয়েছিলেন। আমরা জানি-ধ্যানী-জ্ঞানী, পণ্ডিত-মুর্খ, ধনী-দরিদ্র, বৃদ্ধ-যুবা, নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা মৃত্যুর অধীন। প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরও একদিন হঠাৎ ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন। সেদিন ছিল ৩ চৈত্র ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দ, ১২৯৩ মগাব্দ, ১৮৫৩ শকাব্দ। পরম গুরু পণ্ডিত ভান্তে কঠিন রোগের খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে শত শত ভক্ত-শিষ্য তাঁকে দেখার জন্য সমবেত

হলো। ডাক্তার চিকিৎসক কেউ তাঁকে বাঁচাতে পারল না। পরদিন ৪ চৈত্র ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ (১৯৩২ খ্রিঃ, বৃহস্পতিবার মধ্যরাত ২ ঘটিকার সময় শত শত গুণগ্রাহী ভক্তশিষ্যদের শোক সাগরে ভাসিয়ে মহাঋষি শাসনধবজ পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। চিরকালের জন্য চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন বাঙালি বৌদ্ধ জনমানসের শ্রদ্ধা ও গৌরবদীপ্ত মহান সাধক জ্ঞান তাপস শাসনধ্বজ পণ্ডিত প্রবর শ্রীমৎ প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির। শত শত নারী -পুরুষ, হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ ভক্ত তাঁর আকস্মিক তিরোধানে স্বজন হারার বেদনায় ব্যথিত হলো। চারদিকে অনুরণিত হলো পণ্ডিত ভান্তে আর আমাদের মাঝে নেই, আর কোনোদিন তাঁর ললিত কণ্ঠে মধুর অমৃতময় ধর্মবাণী শুনতে পাবো না। 'অনিচ্চাবত সংখ্যারা উপ্পাদ বয ধম্মিনো।'

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

বিভিন্ন মুখী প্রতিভার অধিকারী মহাপণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের গুণরাশি বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। বাল্যাবধি তিনি ছিলেন সদ্ধর্মের প্রতি অনুগত প্রাণ। শ্রদ্ধায় তিনি গ্রহণ করেছিলেন প্রবজ্যাধর্ম, জীবনের পুরোটা সময়ে সদ্ধর্মের গৌরব বৃদ্ধিতে সদা সচেষ্ট ও আত্ম নিবেদিত ছিলেন। অতি শ্রদ্ধার সাথে তিনি প্রাতিমোক্ষশীল সযত্নে রক্ষা করতেন। তাই তিনি ছিলেন বিনয়ী। যিনি বিনয়ী তিনি শীলবান; শীলবান অর্থই হচ্ছে পূত পবিত্র চরিত্রের অধিকারী। পূতপবিত্র চরিত্রবান সর্বত্র পূজিত প্রশংসিত, এমনকি দেবগণেরও নমস্য। শীলবানের শীলতেজ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। শাস্ত্রে বলা হয়েছে;

শীলগন্ধসমো গন্ধো কুতো নাম ভবিস্সতি
যো সমং অনুবাতে চ পাটিবাতে চ বায়তি।

শীলরূপ সুগন্ধের সমান মনোরম সুগন্ধ আর কোথাও নেই। এর সুবাস বায়ুর অনুকুল প্রতিকুলে সমানভাবে প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ শীলবানের সুকীর্তিরূপ যশখ্যাতি সর্বত্র প্রচারিত হয়। তাই বলা হয়েছে।

সোভন্তেব ন রাজানো মুক্তামুনি বিভূসিতা,
যথা সোভন্তি যতিনো সীলভূসনভূসিতা।

শীলরূপ অলংকারে বিভূষিত ভিক্ষুগণ যেভাবে সর্বত্র ভূষিত হয়ে থাকেন, মনিমুক্তাদি দ্বারা সর্বালংকারে অলংকৃত নরপতিগণও তেমন সোভিত হন না।

ভিক্ষুকুল অহংকার শীলগুণে বিভূষিত পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্য ছিলেন শীলবান ভিক্ষুসংঘের অন্যতম প্রতীক।

তিনি ছিলেন কায়-বাক্য-মনে সংযত। তাঁর প্রতিটি বাক্য ছিল অমৃতবৎ মধুমাখা। কখনো কটু বাক্য তাঁর মুখে উচ্চারিত হতো না। তিনি ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব অতি সহজ ও সরল ভাষায় দেশনা করতে অদ্বিতীয় ছিলেন। সকল শ্রেণীর মানুষ তাঁর অমৃতময় ধর্মব্যাখ্যা শোনে বিমোহিত হতেন। তাঁর অমায়িক ব্যবহার, দয়া-দাক্ষিণ্য, দূরদর্শী চিন্তাচেতনা, সুমিষ্ট ভাষণ, স্নেহসিক্ত বাক্যালাপ, উদারতা, মানবতাবোধ, সর্বজনের প্রতি অপ্রমেয় মৈত্রী ও ভালোবাসা, সুষমামণ্ডিত আচরণ তাঁকে অজাতশত্রু হিসেবে অভিহিত করা যায়। তিনি ছিলেন সর্বদা কুশল কর্মে নিরত পরমার্থ মানব। তাঁর মধ্যে কোনো প্রকার অহংকার বোধ ছিল না। একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত হয়েও নিজেকে কখনো পণ্ডিতমন্য মনে করতেন না।

তাঁর জীবন জীবিকাও ছিল অতি সাধারণ। যথালাভে সন্তুষ্টি ছিল তাঁর জীবনের চাওয়া। সাধারণ ত্রিচীবরে তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন। যা কিছু দান পেতেন তিনি প্রতি মাসে ভিক্ষুসংঘ আহ্বান করে সংঘদান করে দান করে দিতেন।

দান দেওয়ার সময় ভিক্ষুসংঘ ছাড়া প্রচুর ধর্মপ্রাণ জনসাধারণের সমাগম হতো। তিনি কাকেও অভূক্ত যেতে দিতেন না। এমন উদার দানশীল ভিক্ষু সমাজে সত্যি বিরল। তাঁর দানযজ্ঞে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ সমাগত হয়ে অংশ গ্রহণ করত।

তাঁর মতো এতবড় একজন সাধক, ধর্ম দেশক, সংগঠক, ধর্ম প্রচারক, সমাজ ও সদ্ধর্ম হিতৈষী সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের গুণাবলী আমার মতো একজন অজ্ঞান ভিক্ষুর পক্ষে প্রকাশ করা মোটেই সম্ভব নয়। তবু আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে তাঁকে যৎকিঞ্চিৎ উপলব্ধি করতে পেরেছি তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র উপস্থাপন করলাম।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

মহান ভিক্ষুকুল গৌরব সাধক প্রবর পণ্ডিত শাসনধ্বজ প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। গুরুদেবের মৃত্য সংবাদ পেয়ে শত শত মানুষ পরদিন সকালে হতে সমবেত হতে লাগলো। বিশেষ করে পার্শ্ববর্তী চেনামতী, ওসখাইন, বাথুয়া, বড়িয়া, তিসরী এবং তালসারা গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা দলে দলে উপস্থিত হতে লাগলো মুচ্ছদ্দীপাড়া বিবেকারাম বিহার চত্বরে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য। সমাগত নেতৃবৃন্দ প্রয়াত গুরুদেবের মরদেহ সর্বোচ্চ ধর্মীয় মর্যাদায় সৎকার করার জন্য ভেষজ ঔষধ প্রয়োগে সংরক্ষণ করতে ঐক্যমত পোষণ করলেন। ৭ চৈত্র রবিবার মহাস্থবিরের শবদেহ পেটিকাবদ্ধ অনুষ্ঠানের দিন ধার্য হলো। এ দিনের ব্যয় নির্বাহের জন্য সপ্ত গ্রামবাসী স্ব স্ব গ্রাম হতে অর্থ, চাল, দানীয় সামগ্রী সংগ্রহ করে দিলেন। ৬ চৈত্র শনিবার বিকালে সমাগত ভিক্ষুসংঘ ও নেতৃবৃন্দ শ্রীমৎ তেজবন্ত বঙ্গচন্দ্র মহাস্থরিরকে সভাপতি করে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্য নির্বাহক কমিটি গঠন করেন। পরদিন সকালে কার্য নির্বাহক কমিটির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য সপ্ত গ্রামবাসী ৬৪০ টাকা ও ১৭৫ আড়ি চাল দিতে প্রতিশ্রুতবদ্ধ হন। এ সভায় অতি সমারোহে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সুসম্পন্ন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পেটিকাবদ্ধ অনুষ্ঠানে সপ্তগ্রামের নর-নারী ভক্ত অনুসারী ছাড়া দূর দূরান্ত বহু গ্রাম থেকে কয়েক হাজার মানুষ সমবেত হয়। শ্রীমৎ তেজবন্ত বঙ্গচন্দ্র মহাস্থবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় স্মৃতিচারণ সভা। সভায় চট্টগ্রাম বৌদ্ধ মন্দিরের অধ্যক্ষ অধ্যাপক অগ্‌গমহাপণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মবংশ মহাস্থবির, আর্যশ্রাবক শ্রীমৎ জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির, পাঁচরিয়া গ্রাম নিবাসী প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সমাজহিতৈষী বিপিনচন্দ্র বড়ুয়া, পিংগলা নিবাসী শিক্ষক যুগল কিশোর বড়ুয়া, উনাইনপুরা নিবাসী বগলাভূষণ বড়ুয়া বি, এল, ও অতুল চন্দ্র বড়ুয়া বি, এল, গোয়ালপাড়া নিবাসী নগেন্দ্র লাল বড়ুয়া বি, এল, সাতবাড়িয়া নিবাসী শিক্ষক বিপিন চন্দ্র বড়ুয়া ও হর কিশোর চৌধুরী, পিঙ্গলা নিবাসী মহিম চন্দ্র বড়ুয়া ও দীনবন্ধু বড়ুয়া ছাড়া আরো অনেকে প্রয়াত মহাস্থবিরের কর্ম ও জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

করেন। এ সভায় সর্বসম্মতভাবে প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের শবদাহ ক্রিয়া অতি সমারোহে এবং ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যে সম্পাদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেদিনের সভায় দুটি ফাণ্ড গঠন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটি সবদাহ ফাণ্ড আর একটি প্রজ্ঞাতিষ্য স্মৃতিরক্ষা ফাণ্ড। সমবেত সুধীজনের সিদ্ধান্ত ছিল এরূপ-যেহেতু সচরাচর কোনো ভিক্ষুর শাবদাহ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে প্রচুর অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী অনুদান পাওয়া যায়। সেই অর্থ শুধু খাওয়া দাওয়া কিংবা অন্যান্য বাবত সম্পূর্ণরূপে খরচ না করে পরলোকগত ভিক্ষুর নামে একটি স্মৃতিফাণ্ড গঠন করে সমাজ সদ্ধর্মের কল্যাণকর কিছু কাজ করা সমীচীন হবে। এলক্ষ্যে উপরোক্ত দু'টি ফাণ্ড গঠন করা হয়েছিল। যথাসম্ভব ব্যয় সংকোচন করে শবদাহ ফাণ্ডের উদ্বৃত টাকা স্মৃতি ফাণ্ডে জমা দেওয়া হবে। এই স্মৃতি ফাণ্ড থেকে গরীব দুঃস্থ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান এবং প্রয়াত প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের তিরোধান দিবস ৪ চৈত্র প্রতিবছর স্মৃতি পূজা ও সভার আয়োজন করবে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও প্রজ্ঞাতিষ্য স্মৃতি রক্ষা ফান্ড-এর ব্যাপারে কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি শ্রীৎ তেজবন্ত বঙ্গচন্দ্র মহাস্থবিরের নামে আবেদন পত্র এবং প্রয়াত মহাস্থাবিরের প্রধান শিষ্য শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ স্থবিরের নামে নিমন্ত্রণ পত্র ছাপানো হলো। উল্লেখ্য এ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন বাবু সুরেন্দ্রলাল তালুকদার।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কার্য সম্পাদন ও স্মৃতি ফাণ্ড গঠন কল্পে প্রদ্ধাদান সংগ্রহের জন্য অনেকে স্বপ্রনোদিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে শ্রীমৎ বুদ্ধানন্দ ভিক্ষু, মুচ্ছদ্দিপাড়ার শশীকুমার মুচ্ছদ্দি, বাথুয়ার বিহারাধ্যক্ষ শ্রীমৎ উত্তমানন্দ স্থবির ও রোহিনী রঞ্জন চৌধুরী, রুদুরা গ্রামের বিপিন চন্দ্র বড়ুয়া ও উপেন্দ্রলাল বড়ুয়া, মুচ্ছদ্দিপাড়ার শ্রীমৎ সুভূতি ভিক্ষু ও বিমল রঞ্জন মুচ্ছদ্দি, তালসরার প্রেমলাল তালুকদার ও দেবরাজ বড়ুয়া, তিশরীর জগতচন্দ্র চৌধুরী অন্যতম। এছাড়া স্বনাধন্য শ্রীমৎ তেজবন্ত মহাস্থবির, শ্রীমৎ অভয়তিষ্য মহাস্থবির, শ্রীমৎ ধর্মরশ্মি মহাস্থবির, শ্রীমৎ অগ্রলংকার স্থবির, শ্রীমৎ উঃ শাসন ভিক্ষু নিজ নিজ গ্রামের শ্রদ্ধাদান সংগ্রহ করেছিলেন। আবার কোনো কোনো গ্রামবাসী নিজেরাই স্ব স্ব গ্রামের শ্রদ্ধাদান সংগ্রহ

করে এমন কি বিদেশ থেকেও অনেক শ্রদ্ধাবান ভক্ত প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও স্মৃতি ফাণ্ডে অর্থ প্রেরণ করেছিলেন। মহাপুরুষের মহান পুণ্য প্রভাবে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ ও দানীয় সামগ্রী সংগৃহীত হলো। সপ্তাহ পূর্ব থেকে জিনিসপত্রে ভাণ্ডার পূর্ণ হতে লাগল।

ক্রমান্বয়ে মহান সাধকপুরুষ শাসনধ্বজ প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন ৪ জ্যৈষ্ঠ ঘনিয়ে আসতে লাগল। ২৩ বৈশাখ কার্যনির্বাহক সমিতির সভা আহ্বান করা হলো। সভাপতি শ্রীমৎ তেজবন্ত মহাস্থবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য সপ্তগ্রামবাসীকে কার্যভার বন্টন করে দেওয়া হল। বিভিন্ন গ্রাম থেকে নিযুক্ত কর্মীবাহিনী স্বপ্রণোদিত হয়ে সার্বিক সহযোগিতা ও অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালনে প্রতিশ্রুতবদ্ধ হন।

বাথুয়া গ্রামের কর্মীদের তরকারী রান্নার দায়িত্ব, ওসখাইন গ্রামের কর্মীদের ভাত রান্নার দায়িত্ব, তিশরী গ্রামের কর্মীদের ভিক্ষুসংঘের পরিচর্যার দায়িত্ব, বড়িয়া ও রুদুরার গ্রামবাসীকে অতিথিবর্গের আপ্যায়নের দায়িত্ব, তালসরা ও মুচ্ছদ্দিপাড়াবাসীকে জিনিসপত্র সংগ্রহ ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব, চেনামতী, তালসরা এবং ওসখাইনবাসী মহিলা কর্মীদেরকে মহিলা অভ্যর্থনার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

এদিকে সপ্তাহকাল পূর্ব হতে মুচ্ছদ্দিপাড়ায় প্রয়াত পুণ্যপুরুষ প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের অন্তিম বাসস্থান বিবেকারাম বিহারচত্বর সাজ সাজ রবে মহা ধুমধাম শুরু হয়েছে। প্রতিদিন শত শত নর-নারী আর ভিক্ষুসংঘের আগমনে মুখরিত হয়ে উঠছে। অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গ সুন্দর করার অভিপ্রায়ে সকলেই নিবেদিত প্রাণ। সমগ্র বিহার প্রাঙ্গনব্যাপী বিশাল সভামণ্ডপ। ৭০ হাত দীর্ঘ পুরুষদের ভোজনশালা, ৪৫ হাত দীর্ঘ মহিলাদের ভোজনশালা, ৩২ হাত দীর্ঘ রন্ধনশালা, ২৬ হাত দীর্ঘ ভাণ্ডারগৃহ প্রস্তুত করা হলো। নানা প্রকার রঙ বেরঙের কাগজের ফুল দিয়ে সভামণ্ডপসহ সমগ্র বিহার চত্বর সাজানো হলো। অপূর্ব সাজে সজ্জিত বিবেকারাম বিহার এলাকা যেন আমরাপুরীতে পরিণত হয়েছে।

৩ জ্যৈষ্ঠ সকালবেলা হতে বিভিন্ন গ্রাম থেকে ভিক্ষুসংঘ এবং দর্শনার্থী

আসতে লাগলেন। আহারের পর রাত ১০ ঘটিকার সময় তিতন মহাস্থবির নিকায়ের স্বনামধন্য ভিক্ষুকুলগৌরব পণ্ডিত শ্রীমৎ গুরাধন মহাস্থবিরের সভাপতিত্বে এক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রয়াত প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থাবিরের জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন অগ্রমহাপণ্ডিত অধ্যাপক ধর্মবংশ মহাস্থবির, বিনজুরীর শ্রীমৎ ধর্মানন্দ মহাস্থবির, শাকপুরার শ্রীমৎ সুমঙ্গল মহাস্থবির, কর্তালার শ্রীমৎ বংশদীপ মহাস্থবির, উনাইনপুরার শ্রীমৎ জ্ঞানীস্বর মহাস্থবির, পাহাড়তলীর শ্রীমৎ ধর্মালোক স্থবির, তেকোটার শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, সাতবাড়িয়ার শ্রীমৎ অভয়তিষ্য মহাস্থবির (সংঘরাজ), কেঁয়াগড় বিহারের সিংহলী ভিক্ষু, উকিল উমেল চন্দ্র মুচ্ছদ্দি, বাবু গিরিশ চন্দ্র বড়ুয়া বিদ্যাবিনোদ, বাবু জয়দ্রথ চৌধুরী প্রমুখ। অতঃপর শেষরাত্রে সভার সমাপ্তি হয়।

৪ জ্যৈষ্ট ১৩৩৯বঙ্গাব্দ। পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন। কাছের, দুরের গ্রাম থেকে দলে দলে হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ নর-নারী এবং প্রয়াত মহাস্থবিরের গুণগ্রাহী জনসাধারণ সমবেত হতে লাগল। সুবিশাল বিহার প্রাঙ্গন, তৎসংলগ্ন পুকুরপাড়, দীঘির পাড়, মাঠ, এমন কি সমগ্র মুচ্ছদ্দিপাড়া লোকে লোকারণ্য। নিকায়ত্রয়ের দুই শতাধিক ভিক্ষুসংঘের উপস্থিতিতে সংঘদান, অষ্টপরিস্কার ও পিণ্ডদান করা হলো। পাঁচ হাজারাধিক পুণ্যার্থী দর্শকদের পরিপাটিরূপে আহার্য পরিবেশন করা হলো।

বেলা দুই ঘটিকার সময় সুবৃহৎ সুশোভিত সভামণ্ডপে হাজার হাজার জনসাধারণের উপস্থিতিতে শুরু হলো স্মৃতিচারণ সভা। সভায় সভাপতিত্ব করেন গহিরা গ্রামের মাননীয় শ্রীমৎ বরজ্ঞান মহাস্থবির। সভায় বিভিন্ন গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে দেওয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি পঠিত হলো। অতঃপর মহাত্মা প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের জীবনের বিভিন্ন গুণাবলী স্মরণ করে এবং তাঁর স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য স্মৃতি ফাণ্ড গঠনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন পণ্ডিত অধ্যাপক ধর্মবংশ মহাস্থবির, শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ স্থবির, পাঁচরিয়া নিবাসী শিক্ষাবিদ বিপিন চন্দ্র বড়ুয়া, উনাইনপুরা গ্রাম নিবাসী জয়দ্রথ চৌধুরী, সাতবাড়িয়া গ্রাম নিবাসী শিক্ষক হরকিশোর চৌধুরী, বেলখাইন গ্রাম নিবাসী শিক্ষক নির্মল চন্দ্র বড়ুয়া, পিঙ্গলা নিবাসী শিক্ষক

যুগল কিশোর বড়ুয়া, কর্তালা গ্রাম নিবাসী ডাঃ শান্ত কুমার বড়ুয়া প্রমুখ। বিনয়ধারী, শীলবান, জ্ঞানবান, পরমার্থ সাধক, সুপণ্ডিত, সুকণ্ঠধারী, মিষ্টভাষী, বাগ্মী, সদ্ধর্মসেবক, নিঃস্বার্থ সমাজ সংস্কারক, মুক্ত বুদ্ধি চর্চায় বলিষ্ট কণ্ঠস্বর, নির্ভীক কর্মী, অহিংসা মৈত্রী ও সাম্যের পূর্ণ প্রতীক মহামান্য শাসনধ্বজ প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের প্রতি গুরুগম্ভীর ও সর্বোচ্চ ধর্মীয় মর্যাদায় অনুষ্ঠিত দাহক্রিয়া অনুষ্ঠানে হাজার হাজার ভক্তপ্রাণ জনসাধারণের উপস্থিতিতে সেদিন মুচ্ছদ্দিপাড়া বিবেকারাম বিহার প্রাঙ্গনে অনাবিল শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।

বিকেল ৪ ঘটিকার সময় শুরু হয় শবযাত্রা। সেদিনের সেসময়কার দৃশ্য শাসনধ্বজ শ্রীমৎ প্রজ্ঞাতিষ্য শবদাহ ও স্মৃতিরক্ষা সমিতির কার্যবিবরণে সম্পাদক শ্রী সুরেন্দ্রলাল তালুকদার এভাবে বর্ণনা করেছেন,

"দলে দলে ভেরী বাজিয়া উঠিল। বৌদ্ধ কুলরত্ন পণ্ডিতপ্রবর শাসনধ্বজ শ্রীমৎ প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের পবিত্র পুণ্যময় দেহ রথোপরি উত্তোলন করা হইল। শ্মশান যাত্রার কি অপূর্ব দৃশ্য। পুকুরপাড় মাঠ ইত্যাদি সমস্ত স্থান জন-সমুদ্রে পরিণত হইল। যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায় কেবল দণ্ডায়মান নরমুণ্ড ব্যতীত অন্যকিছু দৃষ্টিগোচর হইল না। মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য অনুমান আটহাজার লোক সমবেত হইয়াছিল।

সকলেই যুগপৎ হর্ষবিষাদে সেই পবিত্র দেহধারী শিল্প বিচিত্র সমুজ্জ্বল রথের দিকে ভক্তি সহকারে চাহিয়া আছে। ভক্তগণ রথ টানিয়া চলিল। চন্দনকাষ্ঠ ও মোমের বাড়ির সাহায্যে পবিত্র অনল মহাত্মার দেহের পবিত্রতা রক্ষা করিল। ধীরে ধীরে দেহ ভস্মিভূত হইয়া গেল। সেবকগণ পবিত্র শরীরের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন।"

এভাবেই হাজার হাজার বৌদ্ধ জনসাধারণের একান্ত শ্রদ্ধার পাত্র, চট্টল বৌদ্ধ সমাজসদ্ধর্মের অন্যতম সংস্কারক, অমৃতভাষী, সমাজ হিতৈষী, কর্মযোগী, সাধক প্রবর পণ্ডিত শাসনধ্বজ প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের নশ্বর জড়দেহ চর্তুভূতে মিশে গেল। কিন্তু তাঁর কীর্তি, তাঁর স্মৃতি আবহমান বাঙালি বৌদ্ধদের হৃদমন্দিরে শক্তি যোগাবে, প্রেরণাদান করবে; শ্রদ্ধায় অবনমিত হবে এই পুণ্যপুরুষের অবিনশ্বর স্মৃতির প্রতি।

পরম সাধক প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের জীবন ছিল দেবতুল্য। বিভিন্ন সময়ে তাঁর দিব্য মূর্তি অলক্ষ্যে সাধারণ মানুষের কাছে প্রতিভাত হয়েছে। এরূপ বহু ঘটনাবলী এখনো সাধারণের কাছে কিংবদন্তীরূপে মুখে মুখে প্রচলিত রয়েছে।

প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের কতিপয় অলৌকিক ঘটনা

(১) তখন তিনি মুচ্ছদ্দিপাড়া বিবেকারাম বিহারের অধ্যক্ষ হিসেবে বাস করছিলেন। রাস্তাঘাট, যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত ছিল না, জনবসতিও ছিল অপেক্ষাকৃত কম। বিহারটিই অনেকটা লোকালয় থেকে অদূরে নির্জনে। বিহারের সম্মুখ দিয়ে গ্রামের চলাচল রাস্তা। একদিন ছত্তার হাট থেকে সওদা করে কয়েকজন ব্যক্তি আসছিল। রাত হয়ে গিয়েছিল, অন্ধকার রাত্রি। গ্রাম্য রাস্তার দুপাশে ঘনগাছের সাড়ি। বিহারের অনতিদুরে এসে তারা দেখতে পেল এক বিকট দীর্ঘাকৃতির সাদা কাপড়ে আবৃত অমনুষ্য তাদের সামনে রাস্তার দু'পাশে পা ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পথিকেরা ভয়ে হতবিহ্বল। উপায়ন্তর না দেখে তারা 'পণ্ডিত ভান্তে'-কে স্মরণ করল, 'ভান্তে, এ বিপদ থেকে রক্ষা করুন'। সঙ্গে সঙ্গে অপদেবতা অদৃশ্য হয়ে গেল। শোনা গেল সুমধুর কণ্ঠস্বর, 'উপাসকগণ, ভয় করো না, 'ত্রিরত্নের নাম স্মরণ করতে করতে বাড়ি চলে যাও।' এ অদ্ভুত অলৌকিক কাণ্ড দেখে পথিকেরা আশ্চর্যবোধ করল এবং পরদিন এ বিষয় সর্বত্র প্রচারিত হয়ে গেল।

(২) কোনো এক সময় সাতবাড়িয়া গ্রামে একটি ধর্মানুষ্ঠানে সাধকশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির তালসরা মুচ্ছদ্দিপাড়া, বাথুয়া ও চেনামতি গ্রামের কয়েকজন দায়কসহ যোগদান করেছিলেন। ধর্মানুষ্ঠান সন্ধ্যায় শেষ হলো। অন্ধকার ঘনিয়ে আসল। সাতবাড়িয়া থেকে তালসরা-মুচ্ছদ্দিপাড়া অনেক দূর পথ। রাত্রির অন্ধকারে দূর্গম মেঠো পথ অতিক্রম করা সত্যি কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। পণ্ডিত ভান্তের সঙ্গীরা রাত্রিবেলায় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে সাহস পাচ্ছিলেন না। তাঁরা প্রমাদ গুণছিলেন, কিভাবে এ দূর্গম পথ অতিক্রম করবেন। সাধক মহাস্থবির হয়তো সঙ্গীদের মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন,

তাঁদেরকে বললেন, 'আপনারা হাত ধরাধরি করে চোখ বন্ধ করুন। ভয় কিংবা উদ্বিগ্নবোধ করার কোনো কারণ নেই,।' তারা চোখ বন্ধ করলেন। ঘোর অন্ধকার রাত। চোখ বন্ধ করায় পৃথিবীর সবকিছুই অন্ধকার হয়ে গেল। বললেন, 'চলুন এবার, ধীরে ধীরে।' তাঁরাও আচার্যের কথামত চোখ বন্ধ করে হাতে হাত ধরে হাঁটতে লাগলেন। কিছুক্ষণ হাঁটার পর মহাস্থবির বললেন, 'চোখ খোলুন।' তাঁরা চোখ খোলে চোখ কপালে; দেখলেন অতি আশ্চর্য ঘটনা, তাঁরা নিমিষের মধ্যে মুচ্ছদ্দিপাড়ায় উপনীত হয়েছেন। সঙ্গী উপাসকেরা ভন্তেকে শ্রদ্ধাভরে বন্দনা জানিয়ে স্ব স্ব বাড়ি চলে গেলেন। আর সেদিনের অত্যাশ্চার্য ঘটনা পরদিন হতে সর্বত্র প্রচারিত হতে লাগলো।

(৩) মুচ্ছদ্দিপাড়ার নিকটবর্তী চেনামতি গ্রামের কাছে নাথপাড়া। সেই নাথপাড়ার দু'জন লোক নিকটবর্তী একটি ডোবা (খাই-খাইয়া = জলাশয়) মাছ ধরার জন্য জল নিঃস্কাশন করছিল। জল সিঞ্চন করতে করতে কখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে রাত হয়ে গেছে তারা বুঝতে পারেনি। জল সিঞ্চন করতেই ছিল। ধীরে ধীরে রাত গভীর হতে লাগলো। কিন্তু তাদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তারা অনবরত বিরামহীনভাবে জল সিঞ্চনে ব্যস্ত। তখনকার দিনে ভূত-প্রেত ইত্যাদি অমনুষ্যের উৎপাত ছিল। উক্ত লোক দু'টিকেও মেছো-ভূতে পেয়ে বসেছিল। সাধক প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির তাঁর সাধনপীঠ মুচ্ছদ্দিপাড়া বিবেকারাম সাধনকুঞ্জে সাধনায় বসে এ বিষয় অর্ন্তদৃষ্টিতে দেখতে পেলেন। তিনি ত্বড়িৎ গতিতে উক্ত জলাশয়ের নিকট উপস্থিত হয়ে জলসিঞ্চনরত ব্যক্তিদ্বয়কে বললেন, 'ওহে, এত গভীর রাতে তোমরা কি করছ?' মহাস্থবিরের কণ্ঠস্বর শোনার সাথে সাথে তাদের সম্বিৎ ফিরে এলো। জল সেচনে বিরতি দিয়ে তাকাল, দেখতে পেল পরম পুরুষ প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরকে। তাঁরা অবনত মস্তকে অভিবাদন করে বললো, 'আমরা তো বুঝতে পারিনি রাত যে গভীর হয়েছে।' মহাস্থবির বললেন, 'তোমরা ওঠে এসো এবং আমাকে অনুসরণ কর।' ভন্তের কথামতো তারা তাকে অনুসরণ করতে লাগলো। অল্পক্ষণের মধ্যে বাড়ি পৌঁছলো। তারা নিজেদের ভীষণ দূর্বল বোধ করল। তখন রাত গভীর, পাড়া-পড়শী নীরব-নিস্তব্ধ। ধীরে ধীরে বুঝতে পারলো তারা মেছোভূতের খপ্পর থেকে সাধক প্রজ্ঞাতিষ্যের

করুণায় জীবনে বেঁচে এসেছে।

(৪) কথিত আছে, পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের অন্যতম প্রিয় শিষ্য আনন্দস্বামী স্থবির কোনো একসময় অন্ধকার রাতে শ্মশানে সাধনায় অভিরমিত হয়েছিলেন। তাঁর ধ্যানানুশীলন ছিল প্রথম পর্যায়। লোকমুখে এখনো শোনা যায় যে, তখনকারদিনে ভূত-প্রেত ইত্যাদি অপদেবতার উৎপাত বেশী ছিল। কারণ তখনকার সময়ের জনসাধারণের ধর্মজ্ঞান কম ছিল। আর্থিক দৈনতা ছিল, ফলে বর্তমানের মতো মৃত ব্যক্তির সদ্‌গতি কামনায় দানাদি পুণ্যকর্ম করতে সমর্থ হতো না। আনন্দস্বামী শ্মশানে ধ্যানমগ্ন হলে রাতে তিনি অমনুষ্য কর্তৃক আক্রান্ত হন। তিনি অতি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ত্রিরত্নসহ গুরুদেবকে স্মরণ করতে লাগলেন। তৎক্ষণাৎ গুরুদেব শিষ্যের ডাকে সারা দিয়ে গভীর রাতে শ্মশানে উপনীত হয়ে শিষ্যকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলেন। অতঃপর গুরু শিষ্যকে বিদর্শন ধ্যান অনুশীলনের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছিলেন।

(৫) তখন প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের পাণ্ডিত্য সর্বত্র প্রচারলাভ করেছিল। তিনি তাঁর বক্তব্য বিষয়কে এমন যুক্তি উপমা সহকারে উপস্থাপন করতে পারদর্শী ছিলেন যে, শ্রোতামণ্ডলী অভিভূত হয়ে যেত। তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা শোনে তাঁকে পরাজিত করার অভিপ্রায়ে দু'জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত একদিন তাঁর সাধনকুঞ্জ বিবেকারাম বিহারে উপনীত হয়েছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল পণ্ডিত ভান্তের সঙ্গে তর্কে অবতীর্ণ হয়ে তাঁকে পরাজিত হরা। ব্রাহ্মণদ্বয় বিহারে প্রবেশ করে প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরকে সম্বোধন করে হাত তোলে নমস্কার জানিয়ে তাঁদের আগমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করল, 'সাধুরাজ, আমরা এখানে এসেছি আপনার সাথে কিছু ধর্মদর্শন আলোচনা করার উদ্দেশ্যে। আপনি যদি আমাদের জিজ্ঞাসার যথার্থ উত্তর দিতে সমর্থ হন তাহলে আমরা আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করব, আর যদি আমাদের নিকট পরাজয় বরণ করেন তাহলে আপনার পাণ্ডিত্যের আসরতা প্রমাণিত হবে।' প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির বললেন, 'আপনারা বসুন।' সেবককে নির্দেশ দিলেন ব্রাহ্মণদ্বয়ের উপবেশনের আসন ও জলযোগ প্রদান করার জন্য। অতঃপর তিনি পায়চারি করতে লাগলেন। ব্রাহ্মণদ্বয় উপবেশন করে প্রদত্ত জলযোগ গ্রহণ করলেন।

প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের মুখে কোনো বাক্য নেই, ব্রাহ্মণদ্বয় পরস্পর গুণ গুণ মন্ত্রনা করছেন। আস্তে আস্তে তাঁরা অধৈর্য হয়ে উঠলেন। ভন্তে নিবিষ্ট মনে পায়চারি করছেন, কোনো কথাই বলছেন না। অনেকক্ষণ হয়ে গেল। ব্রাহ্মণদ্বয় অধৈর্য অসহিষ্ণু হয়ে আবার তাঁদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। সাধক প্রজ্ঞাতিষ্য তাঁদের মনোভাব জ্ঞাত হয়ে নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করে বললেন, 'ব্রাহ্মণ, আপনারা যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমার কাছে এসেছেন এতে আপনাদের উদ্দেশ্যে সফল হবে না। কারণ আপনারা ভোবাদী ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে,

অক্কোধনং বতবন্তং সীলবন্তং অনুস্সদং
দন্তং অন্তিমসারীরং তম্হং ব্রামি ব্রাহ্মণং।

'যিনি ক্রোধহীন, ব্রতপরায়ন, শীলবান, তৃষ্ণামুক্ত, সংযত ও অন্তিমদেহধারী তাঁকেই ব্রাহ্মণ বলা হয়।' আপনারা কুট বুদ্ধি নিয়ে এখানে এসেছেন, আপনাদের চিত্ত কলুষিত; আপনারা ক্রোধান্ধ, অসংযত, কাজেই আপনারা তর্কে অবতীর্ণ হবার পূর্বেই পরাজিত হয়েছেন। আপনাদের সাথে তর্ক করাটাই বৃথা।' মহাস্থবিরের কথা শোনে ব্রাহ্মণদ্বয়ের জ্ঞানোদ্বয় হলো। তাঁরা কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে প্রস্থান করলেন।

(৬) একদিন পটিয়া থানার অর্ন্তগত শাহমীরপুর (প্রকাশ জুলদা) গ্রামের জনসাধারণ প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরকে ফাং (নিমন্ত্রণ) করেছিলেন। সেদিন সকাল থেকে বৃষ্টি, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। এদিকে বেলাও বাড়তে লাগলো। প্রাকৃতিক দূর্যোগ দেখে তাঁর শিষ্যগণ ফাং-এ যেতে বারণ করলেন। কিন্তু ভক্তের আকাঙ্খা তো তাঁকে পূরণ করতে হবে। তিনি পাত্র-চীবর নিয়ে শিষ্যদের অভয় দিয়ে যাত্রা করলেন। অনেক দূর পথ, অথচ অল্প সময়ের মধ্যে তিনি শাহমীরপুর গ্রামে গিয়ে উপনীত হয়েছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে তাঁর চীবর একটুও সিক্ত হয়নি। এরূপ বিস্ময়কর অবস্থা দেখে সকলেই অভিভূত হয়ে গেল। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় সকলে নমিত হয়ে পড়ল।

(৭) শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের জীবৎকালে তালসরা মুচ্ছদ্দিপাড়া ও চেনামতি গ্রামের কয়েকজন যুবক মুচ্ছদ্দিপাড়া বিহার সংলগ্ন এলাকায়

বনভোজনের আয়োজন করেছিল। যুবকেরা গভীর রাত পর্যন্ত কেউ নাচ-গান, কেউ বা রান্নার আয়োজন, কেউ বা রান্নার কাজ করেছিল। কেউ কেউ মুরগী কেটে রান্না করার জন্য প্রস্তুত করল। জনশ্রুতি আছে, ভাত ও মাংস কিংবা অন্যান্য তরকারী দীর্ঘক্ষণ রান্না করার চেষ্টা সত্ত্বেও সম্ভব হয়নি; ভাত-তরকারী কোনোটাই সিদ্ধ হলো না। অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর ব্যর্থ হয়ে তারা উপলব্ধি করল, পণ্ডিত ভান্তের বিহার সংলগ্ন এলাকায় অবৌদ্ধোচিত প্রাণি হত্যা করায় নিশ্চয়ই এরূপ হয়েছে। তারা সকলে সাধকশ্রেষ্ঠ মহাস্থবিরের নিকট উপস্থিত হয়ে নিজেদের কৃত কর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলো। মহাস্থবির তাদের প্রাণিহত্যাদি পঞ্চশীল রক্ষা করার জন্য উপদেশ দিলেন।

(৮) পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের মহাপ্রয়াণের বেশ কয়েক বছর পরের ঘটনা। তখন মুচ্ছদ্দিপাড়া বিবেকারাম বিহার পরিচালনা করতেন তালসরা আনন্দ বিহারের অধ্যক্ষ কর্মবীর শ্রীমৎ বুদ্ধদত্ত মহাস্থবির, সংঘরাজ শ্রীমৎ শাসনশ্রী মহাস্থবির এবং সপ্তগ্রামের অপরাপর ভিক্ষুসংঘ ও দায়ক-দায়িকাবৃন্দ। বিবেকারাম সাধনপীঠের সংলগ্ন যে পুস্করিণীটি রয়েছে সেটা ভরে গিয়ে কচুরীপানায় পূর্ণ হয়ে গেলে সেটা সংস্কার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অনন্তর পুস্করিণী পরিস্কার করে জল নিস্কাষণের জন্য লোক নিয়োগ করা হলো। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, জল রাতদিন নিস্কাষণের পরও শেষ হচ্ছিল না। সকলে এ দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেল। অবশেষে প্রয়াত বুদ্ধদত্ত মহাস্থবিরসহ উদ্যোক্তাগণ পণ্ডিত ভান্তের শ্মশান মন্দিরে পূজা দিয়ে তাঁদের সদুদ্দেশ্য প্রকাশ করে প্রার্থনা জানালেন যে, 'পুকুর ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে জল অপরিস্কার হয়ে গেছে বিধায় জনসাধারণের পানীয় জলের অভাব হয়েছে। এমতাবস্থায় পুকুরের সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে জল নিস্কাষণ করা হচ্ছে, মাছ নিধন করার জন্য নয়। অতএব হে সাধক পুরুষ, আপনি আমাদের সহায়তা করুন।' প্রার্থনা জানানোর পর জল নিস্কাষণ করা সম্ভব হয়েছিল। এসব বিষয় এখনো এ অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে শোনা যায়।

(৯) অন্য কোনো সময় জনৈক ব্যক্তি মাছ ধরার জন্য উক্ত পুকুরে জাল ফেলেছিল। কিন্তু পুকুর থেকে জাল অনেক চেষ্টা করেও উঠাতে পারল

না। উক্ত ব্যক্তি এতে ভীষণভাবে ভীত হয়ে পড়লো। বাড়ি গিয়ে সে অসুস্থ হয়ে পড়লো এবং দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর পণ্ডিত ভান্তের শ্মশান মন্দিরে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে পূজা দিয়ে আরোগ্যলাভ করেছিল।

(১০) পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের পরলোক গমনের বেশ কয়েক বছর পরের ঘটনা। তাঁর স্মৃতিমন্দির জরা-জীর্ণ হয়ে পড়লে পুনঃ নির্মাণের প্রয়োজন হয়। নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পথে, মন্দিরের বাইরে আস্তরের কাজ চলছে। একদিন কাজ করার সময় মন্দিরের প্রায় ৪০ফিট উঁচু থেকে একজন নির্মাণ শ্রমিক পা পিছলে নীচে পড়ে গেলো। উপস্থিত সকলেই মনে করেছিল লোকটির নির্ঘাত মৃত্যু হবে। সকলে হায় হায় করে তার কাছে ভীর জমালো। সদ্ধর্ম আর পণ্ডিত ভান্তের প্রভাবে লোকটি অলৌকিকভাবে বেঁচে গেল, এমন কি কিঞ্চিৎ পরিমাণ আঘাত পায়নি। এরূপ অত্যাশ্চার্য ঘটনা দেখে পণ্ডিত ভান্তের প্রতি সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা বর্ধিত হলো।

এরূপ বহু অদ্ভুত ও অলৌকিক ঘটনা পণ্ডিত সাধক শাসনধ্বজ শ্রীমৎ প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের জীবনে সংঘটিত হয়েছে, যা এখনো এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মধ্যে কিংবদন্তী হিসেবে প্রচলিত হয়ে আসছে। বস্তুত পক্ষে এসব ঘটনা কোনো সাধক মুক্ত পুরুষের জীবনেই সম্ভব। তাই এখনো এ অঞ্চলের বৌদ্ধরাসহ অপরাপর সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে পণ্ডিত ভান্তে একজন মুক্ত অধ্যাত্মিক পুরুষ হিসেবে সম্মানিত ও পূজিত হচ্ছেন।

সপ্তগ্রাম শাসন কল্যাণ ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদ

মহামনীষী প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের পরলোক গমনের পর তাঁর স্মৃতিকে ধরে রাখার মানসে ভক্ত-অনুসারীবৃন্দ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'সপ্তগ্রাম প্রজ্ঞাতিষ্য স্মৃতি সমিতি।' এ সমিতি পরবর্তীকালে 'সপ্তগ্রাম শাসন কল্যাণ ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদ' নামে রূপান্তরিত করা হয়। বর্তমান এটা সপ্তগ্রামের শাসন-সদ্ধর্মের কল্যাণ সাধনে কাজ করে যাচ্ছে। এ সমিতির মূল লক্ষ্য এবং আদর্শ হচ্ছে সপ্তগ্রাম অর্থাৎ তালসরা-মুচ্ছদ্দিপাড়া, চেনামতি, ওষখাইন, তিশরী, রুদুরা, বাথুয়া ও বড়িয়া গ্রামের পশ্চাৎপদ বৌদ্ধ জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম শিক্ষা, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পৃষ্টপোষকতা করে নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি করা। এ সমিতির সভাপতি ও সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে, সভাপতি

শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির, শ্রীমৎ প্রিয়ানন্দ মহাস্থবির, শ্রীমৎ শাসনশ্রী মহাস্থবির, শ্রীমৎ শাসনমিত্র ভিক্ষু। সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন মাষ্টার সুরেন্দ্র লাল বড়ুয়া, কর্মবীর বুদ্ধদত্ত মহাস্থবির, প্রদ্যেত কুমার বড়ুয়া, সঞ্জীব চন্দ্র বড়ুয়া, অমলেন্দু বিকাশ বড়ুয়া।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মুচ্ছদ্দীপাড়া বিবেকারাম বিহারের জন্য ৪৯ শতক জমি দান করেছিলেন প্রয়াত শ্রীমতি সুধনী বড়ুয়া প্রকাশ কলার মাতা। এছাড়া ৮৯ শতক জলেপাড়ে পুকুরসহ জমি দান করেছেন মাষ্টার বিমল চন্দ্র মুৎসুদ্দী ও সুশীল মুচ্ছুদ্দী।

বর্মমানে এ সমিতি 'সপ্ত গ্রাম শাসন কল্যাণ ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদ' নামে এতদঞ্চলের জন সাধারণের ও নৈতিক উন্নতি সাধনে কাজ করে যাচ্ছে। এর বর্তমান সুযোগ্য সভাপতি মুচ্ছদ্দিপাড়া বিবেকারাম বিহারের অধ্যক্ষ বিনয়শীল সাধক শ্রীমৎ শাসনমিত্র মহাস্থবির। সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন শ্রীমৎ ধর্মমিত্র মহাস্থবির।

পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের সাধনপীঠ মুচ্ছদ্দিপাড়া বিবেকারাম বিহারের বর্তমান অধ্যক্ষ সাধক শাসনমিত্র মহাস্থবিরের কার্যক্রম

পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের পরম সযত্নে গড়া পুণ্যতীর্থরূপে খ্যাত মুচ্ছদ্দিপাড়া বিবেকারাম বিহারের বর্তমান বিহারাধ্যক্ষ বিদর্শন সাধক শ্রীমৎ শাসনমিত্র মহাস্থবির। তিনি ইতিমধ্যে সপ্তগ্রামসহ বাঙালি বৌদ্ধদের মাঝে তাঁর কর্মকৃতি, আদর্শ-গুণশীলতায় দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছেন। জ্ঞানতাপস পরম সাধক প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের সাধন কুঞ্জে তিনি দীর্ঘকাল অবস্থান করে এটার সৌষ্ঠব ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তৎপর রয়েছেন।

বিনয়শীল শ্রীমৎ শাসনমিত্র মহাস্থবির ৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে (২০ অগ্রহায়ণ ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ) আনোয়ারা থানার বর্ধিষ্ণু বৌদ্ধ গ্রাম তালসরার একটি সম্ভ্রান্ত বৌদ্ধ পরিবারে জন্য গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মহেন্দ্রলাল বড়ুয়া ও মাতা সুশীলা বালা বড়ুয়া সদ্ধর্ম পরায়ন ছিলেন। এক বোন তিন

ভাইয়ের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। তাঁর গৃহী নাম সুধীর বড়ুয়া, ডাক নাম খোকন। বাল্যকাল থেকে সুধীর স্বল্পভাষী, ধর্মপরায়ন ও বিনয়ী ছিলেন। বাল্যকালেই তিনি তালসরা আনন্দরাম বিহারের সেবক হিসেবে সদ্ধর্ম ও ভিক্ষু সংঘের সংস্পর্শ লাভ করেন। ফলে ত্রিরত্নের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। সদ্ধর্মের প্রাথমিক পাঠ তিনি লাভ করেন তালসরা আনন্দারাম বিহারের তখনকার অধ্যক্ষ প্রয়াত প্রিয়রত্ন মহাস্থবিরের কাছে (জলদি, বাঁশখালী)। এর পর কর্মবীর বুদ্ধদত্তের কাছে তিন ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে তিনি প্রতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষায় নিজেকে নিয়োজিত রেখে পরৈকোড়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে এস.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ড থেকে সুত্ত ও বিনয়ে উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পটিয়া ডিগ্রী কলেজে এক বছর অধ্যয়ন করার পর পরৈকোড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে পালি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। এখানে দীর্ঘ পনের বছর শিক্ষাকতা করে একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে তিনি সুনাম অর্জন করেন। এছাড়া তালসরা প্রজ্ঞাতিষ্য পালি কলেজেও তিনি বেশ কয়েক বছর শিক্ষকতা করেন। এসময়ে তালসরা-মুচ্ছদ্দিপাড়া বিবেকারাম বিহারের অধ্যক্ষ উপ-সংঘরাজ শ্রীমৎ সুভূতিরত্ন মহাস্থবির ঠেগরপুণি সার্বজনীন বিহারের অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করে চলে যাওয়ায় মুচ্ছদ্দিপাড়া বিবেকারাম বিহারের অধ্যক্ষপদ শূন্য হয়ে পড়ে। স্থানীয় জনগণ ও ভিক্ষুসংঘ পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের সাধন পীঠ বিবেকারাম বিহারের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন সাধনের জন্য শাসনমিত্র মহাস্থবিরকে দায়িত্ব প্রদান করলে তিনি সানন্দে গ্রহণ করেন এবং অদ্যাবধি সেই দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছেন।

তিনি বিবেকারাম বিহারের অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করে বিহারের সার্বিক উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেন। সপ্তগ্রামের মধ্যে বিরাজমান ও সকল দ্বন্দ্ব-বিবাদ নিরসন করে তাদের মধ্যে ঐক্য ও সৌভ্রাতৃত্বভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। তাঁর কর্ম প্রতিভা গুণে তিনি সপ্তগ্রাম শাসন কল্যাণ ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের সভাপতি পদে বরিত হন। তাঁর নেতৃত্বে এ সমিতির কার্যক্রম

অতি সুন্দরভাবে এগিয়ে চলছে। ভিক্ষুসংঘ ও সপ্ত গ্রামবাসী তথা দায়ক-দায়িকাদের মধ্যে মৈত্রীপূর্ণ সৌহার্দ্যভাব বিরাজ করছে। তিনি মুচ্ছদ্দি পাড়া বিবেকারাম বিহার ও পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের স্মৃতি মন্দির সংস্কার সাধন করে পণ্ডিত ভান্তের অন্তিম আরামকে বর্তমানে মনোরম সাজে সজ্জিত করেছেন। তাঁকে সপ্তগ্রামের আপামর জনসাধারণ সহযোগিতা করছে। পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্যের সাধন পীঠ তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় একটি তীর্থভূমিতে পরিণত হয়েছে। প্রতিবছর ৪ চৈত্র প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিনে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয় দিনব্যাপী মেলা। হাজার হাজার সদ্ধর্ম প্রাণ জনসাধারণের উপস্থিতিতে বিবেকেরাম বিহার চত্বর হয়ে উঠে মুখরিত। বিহার চত্বরের বহিরঙ্গনে বসে নানা রকম দোকান আর বিধিকিনির পসরা। আর সকালে অনুষ্ঠিত হয় পণ্ডিত ভান্তের উদ্দেশ্যে মহাসংঘদান ও স্মৃতিচারণ সভা। সভায় পণ্ডিত ও প্রাজ্ঞ ভিক্ষুসংঘ ও নেতৃবৃন্দ প্রয়াত মহাপণ্ডিত সাধকশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের জীবন ও কর্ম নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। উল্লেখ্য যে, শ্রীমৎ শাসনমিত্র মহাস্থবির ইতিপূর্বে সপ্তগ্রাম প্রজ্ঞাতিষ্য স্মৃতি সমিতির সম্পাদক ও পরবর্তীতে সপ্তগ্রাম শাসন কল্যাণ ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।

'শ্রীমৎ শাসন মিত্র মহাস্থবির একজন বিদর্শন সাধকও বটে। তিনি নিজেও বিদর্শন সাধনায় রত হন, আবার অন্যদেরকেও সাধনায় উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি ১৯৯৫ সাল থেকে প্রতি বছর বিবেকারাম বিহার প্রাঙ্গনে ১০ দিনের জন্য বিদর্শন ধ্যান শিবিরের আয়োজন করে থাকেন। এ ধ্যান শিবিরের পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন তিনি। ইতিপূর্বে তিনি বিদর্শনাচার্য ড. রাষ্ট্রপাল মহাস্থবির ও বোধিপাল শ্রামণের কাছে বিদর্শন শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন ।

শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ শাসনমিত্র মহাস্থবির একজন শিক্ষানুরাগী, সদ্ধর্মানুরাগী ও সমাজ হিতৈষী মহান সাংঘিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে সর্বত্র নন্দিত ও প্রশংসিত। তাঁর বেশ কয়েকজন শিষ্য তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন বৌদ্ধদেশে ও উন্নত দেশে অবস্থান করে শিক্ষা গ্রহণ করছে। তিনি সাধ্যমত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে সাহায্য করে থাকেন। এ ছাড়া গরিব জনসাধারণের

বিপদেও তিনি সাহায্যের উদার হস্ত প্রসারিত করতে কার্পণ্য করেন না।

শ্রীমৎ শাসনমিত্র মহাস্থবির সত্যিকার অর্থে সমাজ-সদ্ধর্মের কল্যাণে আত্মনিবেদিত একজন আদর্শ ভিক্ষু। তিনি ব্যক্তিগতভাবে ধর্ম বিনয়ের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল, মিতভাষী, সুদেশক, কর্মোদ্যোগী, অতিথি বৎসল, সদালাপী ও শিক্ষানুরাগী। পণ্ডিত শাসনধ্বজ প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবিরের স্মৃতিধন্য বিবেকারাম বিহারের এবং তাঁর স্মৃতিকে উজ্জ্বলতর করার প্রত্যয়ে শাসন মিত্র মহাস্থবিরের যে অন্তহীন প্রয়াস আমরা লক্ষ্য করি তাতে তাঁকে প্রজ্ঞতিষ্য মহাস্থবিরের সার্থক উত্তরসূরী হিসেবে অভিহিত করা যায়।

বর্তমানে ধর্ম-বিনয়ে শ্রদ্ধশীল ভিক্ষুর সংখ্যা যেন দিন দিন কমে যাচ্ছে। এসময়ে শ্রদ্ধেয় শাসনমিত্র মহাস্থবিরের মতো আদর্শস্থানীয় ভিক্ষুর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। আমরা তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

চিরং তিট্‌ঠতু সদ্ধম্মং।
চিরং তিট্‌ঠতু পঞ্ঞাতিস্‌স।
চিরং তিট্‌ঠতু সাসনমিত্ত মহাথেরো।
জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।

উপসংহার

মানব জীবন অতি ক্ষণস্থায়ী। পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের মধ্যে প্রতিনিয়ত প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ মৃত্যু বরণ করছে। মৃত্যুর পর সব মানুষ স্মৃতির অতল তলে হারিয়ে যায়। অসংখ্য মৃত্যুর মাঝেও কোনো কোনো মৃত্যু সাধারণের কাছে চিরদিন স্মরণের মরমে অম্লান থাকে। তাঁর কর্মকীর্তি অনাদিকাল ধরে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তাঁর অমরত্ব ঘোষণা করে থাকে। এজাতীয় মানুষের মৃত্যু হয় না, তাঁরা মরেও অমর, তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুঞ্জয়ী। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মিষ্টভাষী, অমৃতভাষী, জ্ঞানতাপস, ধ্যানযোগী, শাস্ত্রকোবিদ, বিনয়াচার্য, দৃঢ়চিত্ত, তেজস্বী, ন্যায় পরায়ন, সত্যের সাধক শাসনধ্বজ পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির সেইরূপ কালজয়ী একজন মুক্ত পুরুষ। তিনি লোকান্তরিত হয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর

বিচরণ ভূমিতে তিনি এখনো সর্বজন শ্রদ্ধেয়। তাঁকে যারা দেখেনি তারাও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় অবনমিত। সত্যিই তিনি আজো সর্ব সাধারণের কাছে মরেও অমর, স্মরণীয় ও বরণীয় মহাপুরুষ। তাঁর আত্মত্যাগ, পরহিতৈষণা, উন্নত মন-মানসিকতা, ধর্ম-বিনয়ে গভীর আস্থাশীল, নিষ্ঠাবান ধর্মাচারী ভিক্ষু বর্তমান সমাজে বিরল বললে অত্যুক্তি হবে না। তাইতো পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থাবির সম্পর্কে বলা যায়,

"ইধ মোদতি, পেচ্চ মোদতি
কতপুঞ্ঞো উভয়ত্থ মোদতি
সো মোদতি, সো পমোদতি
দিস্বা কম্মবিসুদ্ধিমত্তনো।
ইধ নন্দতি, পেচ্চ নন্দতি,
কতপুঞ্ঞো উভয়ত্থ নন্দতি,
পুঞ্ঞঞং মে কতন্তি নন্দতি
ভিয্যোনন্দতি সুগ্গতি গতো।" (ধম্মপদ ১৬,১৮)

মহান পুণ্যপুরুষ শাসনধ্বজ প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির সেইরূপ একজন কৃতপুণ্য ব্যক্তি যিনি ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই আত্মপ্রসাদ লাভ করেন ও আনন্দিত হন। স্বীয় কর্ম বিশুদ্ধি দর্শন করে এবং স্মরণ করে তিনি আনন্দ ও পরমানন্দ লাভ করেন।

সর্বসাধারণের প্রতি পরম গুরু প্রজ্ঞাতিষ্যের বাণী

* সর্ব প্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করিবে। কোন প্রাণীকে হিংসা করিবে না। সকল প্রাণীকে আপন প্রাণবৎ জানিবে।
* মৈত্রীভাব পোষণকারী ব্যক্তি সর্বদা সুখে অবস্থান করে। কাহাকেও অবজ্ঞা করা অথবা হেয় প্রতিপন্ন করা উচিত নয়।
* মানব জীবন উত্তরণের জন্য দান-শীল-ভাবনার অনুশীলন করা একান্তই প্রয়োজন।
* মিথ্যা সমালোচনায় দিন অতিবাহিত করা দুঃশীলতারই নামান্তর।
* কাহারো মিথ্যা অপবাদ রটাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করা উচিত নয়।
* আপন বিবেকের উপর দাঁড়াইয়া জীবন পরিচালনা করা শ্রেয়।
* সজ্জন কল্যাণমিত্রের সেবা করা জীবনোন্নতির শুভ লক্ষণ।
* দুঃশীল হইয়া শত বৎসর বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা শীলবান ব্যক্তির এক দিনের জীবন ধারণই শ্রেয়।
* আপন দেহজাত রিপুকে সর্বদা দমন করিবে।
* কন্টকময় সংসারে আপন জীবনকে কলুষিত করা উচিত নয়।
* সর্বদা পুণ্যময় কাজে মতি রাখাই বাঞ্ছনীয়।
* ধন-সম্পদে কাহাকেও মুক্তি দিতে পারে না বরং উহা মুক্তি পথের বিরাট বাধার সৃষ্টি করে।
* নির্লিপ্ত জীবন জ্ঞানীজন প্রশংসিত কিন্তু মূর্খেরা আমার ভাবিয়া সংসারে অতিমাত্রায় আসক্ত হয়।
* সমাজ জীবনে দলাদলি মহাহানিকর। একতাই পরম শক্তি।
* পরসমালোচনা করার চেয়ে আত্মসমালোচনা অথবা পরদোষ অন্বেষণের চেয়ে আপন দোষ আছে কি না তলাইয়া দেখাই সমীচীন।
* মূর্খ ব্যক্তিগণ গুণ বর্ণনার চেয়ে দোষ বর্ণনাই বেশী করে।
* শীল-সংযত ভিক্ষু জীবন দেব-মানবের প্রশংসনীয়।
* পরকে আঘাত দিয়া বা গোপনে ঢিল মারিয়া মান-সম্মান অর্জনের চেষ্টা করা, কাপুরুষের লক্ষণ।

* ছিদ্রান্বেষী বিষধর সর্প সদৃশ মূর্খ মানুষ হইতে সর্বদা দূরে থাকিবে।
* নীতিহীন মানুষের সাথে মেলামেশা করা মহা অন্যায়।
* কুচিন্তা মানুষের অন্তরাত্মাকে যেভাবে কলুষিত ও বিষাক্ত করে অন্যদিকে সচ্চিন্তা মানব জীবনকে উন্নততর সোপানে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।
* হিংসাদগ্ধ অন্তরে অনলসম বাক্য ভাষণ খলতার লক্ষণ।
* সর্বদা মিষ্টি মধুর হৃদয়গ্রাহী সর্বজন গ্রাহ্য উত্তম বাক্য বলাই সমীচীন। কুঠারীসম বাক্য না বলাই উচিত।
* শুধুমাত্র মস্তক মুণ্ডন করিয়া রঙ্গীন বস্ত্র ধারণ করিলে ভিক্ষু হওয়া যায়না। ভিক্ষু উচিত শান্ত দান দমগুণে সমন্বিত হওয়া অবশ্যই কর্তব্য ।
* লোভে দ্বেষ মোহ মানবের পরম শত্রু। এই তিনটি বিষয় ধ্বংসের জন্য দান-শীল ভাবনার অবশ্যই অনুষ্ঠিতব্য।
* রিপুতাড়িত মোহমুগ্ধ মানুষ সংসার দুঃখ হইতে সহজে মুক্ত হইতে পারেনা। মুক্তির পথ আপনার ভিতরে লুক্কায়িত ।
* ত্রিদ্বার সংযত রাখা মুক্তিকামী মানুষের অবশ্যই কর্তব্য
* অপ্রমত্ত মানুষ চিরসুখী
* এই সংসারে একমাত্র ব্যথিত জনেরাই আরেক জন ব থিতের র্মমবেদনা বুঝিতে পারে। 'যাহার বেদনা শেল, সে জানে কেমন?
* মূর্খ মানুষের হৃদয় নাই। ওরা শুধু পরকে নিস্পেষণ করিতে জানে।

ভিক্ষুর মৃত্যুকালীন ছবি

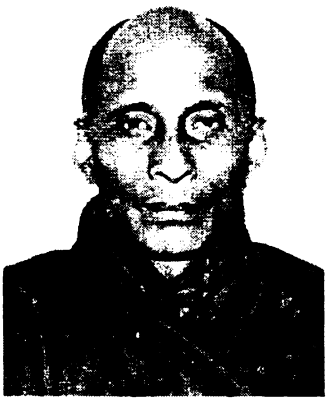

শাসনমিত্র মহাস্থবির

অধ্যক্ষ, তালসরা মুৎসুদ্দীপাড়া বিবেকারাম বিহার
আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।

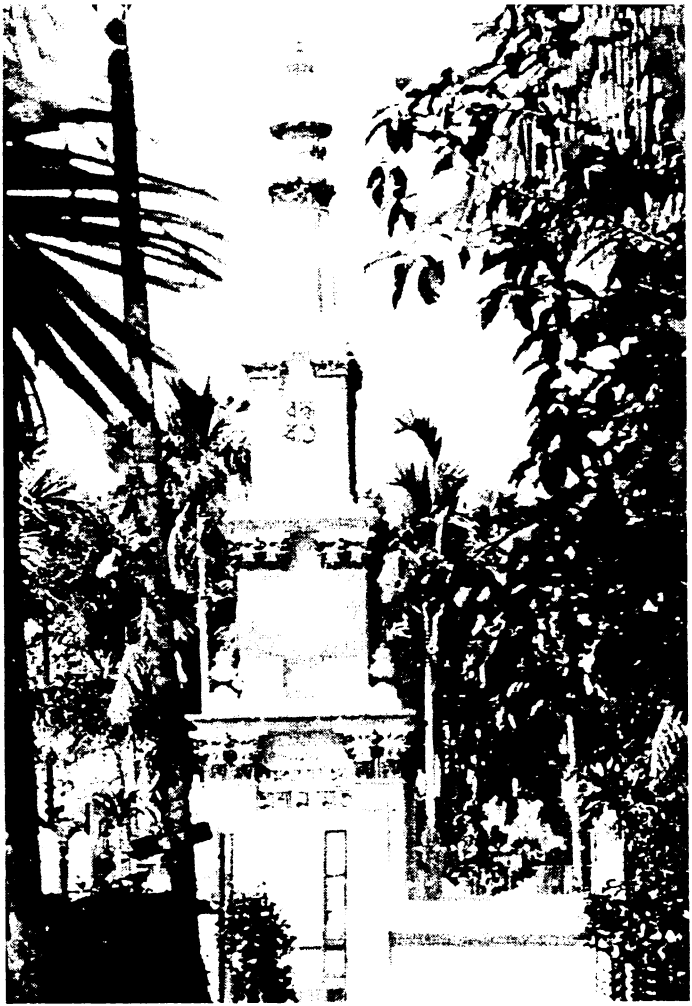

প্রজ্ঞাতিষ্য স্মৃতি মন্দির

লেখক পরিচিতি

কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত চকরিয়া থানার সর্বপূর্বপ্রান্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাহাড়ঘেরা খরস্রোতস্বিনী মাতামুহুরীর তীরে বিলছড়ি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত বৌদ্ধ পরিবারে ১৩৮০ বাংলা সনের ২৩ আষাঢ়, ১৯৭৩ সন, রবিবার, শ্রীমৎ সুমঙ্গল ভিক্ষু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা প্রয়াত প্রিয়তোষ বড়ুয়া, মাতা সারথি বড়ুয়া। তাঁর পিতামহ তরণীসেন সিকদার ডাকসাইটে জমিদার ছিলেন। তিন ভাই দুই বোনের মধ্যে তিনি সকলের বড়। তাঁর গৃহী নাম প্রভাত। তিনি ১৯৯৩ সালে করৈয়ানগরস্থ শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী মহাস্থবিরের নিকট প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পোমরা সাম্য বিহারে শ্রীমৎ আর্যপ্রিয় ভিক্ষুর অন্তেবাসিক শ্রামণ হিসেবে অবস্থান করার সময় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করেন। এসময়ে আর্যপ্রিয় ভিক্ষু গার্হস্থ ধর্ম গ্রহণ করার ফলে সুমঙ্গল শ্রামণ বাথুয়া জ্ঞানোদয় বিহারের অধ্যক্ষ বিনয়াচার্য শ্রীমৎ সংঘরক্ষিত মহাস্থবিরের নিকট পুনরায় শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষা লাভ করে বাথুয়ায় অবস্থান করতে থাকেন। এখানে ১৯৯৭ সালের ১৭ জুন মঙ্গলবার বাথুয়া বদ্ধ সীমায় শ্রীমৎ সংঘরক্ষিত মহাস্থবিরের উপাধ্যায়ত্বে মহামান্য দ্বাদশ সংঘরাজ শ্রীমৎ ধর্মসেন মহাস্থবিরসহ ২১ জন খ্যাতনামা ভিক্ষুর উপস্থিতিতে তিনি শুভ উপসম্পাদা গ্রহণ করেন।

১৯৯৭ সালের ১৬ জুলাই তাঁকে ওসখাইন বিহারের অধ্যক্ষের দায়িত্বে দেওয়া হয়। তিনি এখানে দীর্ঘ পাঁচ বছর দক্ষতার সাথে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি অত্যন্ত সুন্দর সহজ সরল ভাষায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধর্ম দেশনা করতে পারতেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সপ্তগ্রামে সাধারণ উপাসক-উপাসিকাসহ ভিক্ষু সংঘের একান্ত প্রিয়ভাজন হয়ে উঠেছিলেন।

১৯০৪ সালের প্রথম দিকে সুমঙ্গল ভিক্ষু অসুস্থ হয়ে পড়েন। রোগ ক্রমান্বয়ে জটিল আকার ধারণ করায় সেবা সুশ্রুষার জন্য তাকে নিজ বাড়িতে চলে যেতে হয়। কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করার পরও তাঁকে সুস্থ করা গেল না। দীর্ঘ দেড় বছরাধিক কাল রোগ ভোগের পর ২০০৫ সালের ২৮ নভেম্বর মাত্র ৩২ বছর বয়সে এই প্রতিশ্রুতিশীল উদীয়মান তরুণ সংঘসদস্য শ্রীমৎ সুমঙ্গল ভিক্ষুর জীবনাবসান ঘটে।